

পূর্ণেন্দু পত্রী

বাবু সুকুমার রায় শ্রীচরণেষু

বাবু সুকুমার রায় শ্রীচরণেষু

পূর্ণেন্দু পত্রী

বাবু সুকুমার রায় শ্রীচরণেষু

এ· মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ

বইমেলা, ১৯৮৭

প্রকাশক

রঞ্জন সেনগুপ্ত

এ· মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

ফটোটাইপ সেটিং

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড

৭ জওহরলাল নেহরু রোড

কলকাতা-১৩

মুদ্রক

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫২, রাজা রামমোহন সরণী

কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

পূর্ণেন্দু পত্রী

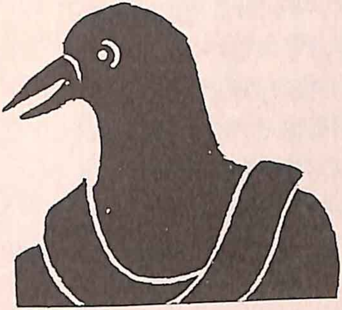
অঙ্গসজ্জায় সহযোগী

পূণ্যব্রত পত্রী

দশ টাকা

লালুকে

এ বছর সুকুমার রায়ের জন্মশতবর্ষ। তাঁকে প্রণাম জানানোই
এই ফ্যান্টাসি রচনার আসল অভিপ্রায়।



১

ভোরের আগের নীলে গা মুড়ি দিয়ে পৃথিবীটা যখন ঘুমিয়ে নিতে চাইছিল আরো কিছুক্ষণ, ঘৃতাচু তখনই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ধড়ফড়িয়ে। ডানার কালো পালকে চোখ কচলে আকাশ-বাতাসের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল সময়টা। না, দেরী হয়নি, ঠিক সময়েই ভেঙেছে তার ঘুম।

ঝাউগিরি বনের এক অর্জুন গাছে তার বাসা। বাসাটা তিনতলা। বা তিনডালের। উপরের ডালে ঘৃতাচু আর তার বৌ সুভক্ষা। তার নীচের ডালে মেয়ে নিত্রানি। তার নীচের ডালে ছেলে সুধাংচু। ছোট পরিবার, সুখী পরিবার।

ছেলে সুধাংচু-র নামকরণের সময় ঘৃতাচুকে মাথা ঘামাতে হয়েছিল ভীষণ। নামের শেষ অক্ষরে চু বজায় রাখাটা তাদের বংশানুক্রমিক প্রথা। ঘৃতাচু-র বাবার নাম লোভাংচু। লোভাংচু-র বাবার নাম দ্রিঘাংচু। দ্রিঘাংচুর বাবার নাম ছিল

মতো ঘিঞ্জি । বেনারসের মাপে সরু সরু অলি-গলি । তবে চারপাশে প্রাচীন ঐতিহ্যের ছড়াছড়ি । ঝাউগিরি সে তুলনায় অনেক ছিমছাম, আধুনিক । ঘৃতাচু-রা আগে থাকতো বাদুড় বাগানেই । ঘৃতাচু-র বাবা লোভাংচু-র জন্ম ঐখানেই । বছর কয়েক হল বাসা করেছে তারা ঝাউগিরিতে, তিনতলা সমান অর্জুন গাছের সেকেন্ড ফ্লোরে ।

রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে বৌ-কে বলা ছিল, বেরবো ঝুঝ্‌কো ভোরে । তাই কাউকে কোনো সাড়া-শব্দ না দিয়ে, কোনমতে তড়িঘড়ি মুখ হাত ধুয়ে, চশমাটা চোখে লাগিয়ে, দরকারী কাগজপত্র বগলদাবা করে ঘৃতাংচু ডানা মিলল ঘাতকারণ্যের দিকে । যেতে হবে প্রায় মাইল পাঁচেক । ঠিক ঘাতকারণ্যে অবশ্য যাবে না সে । যাবে ঐ অরণ্যের কাছাকাছি এক পাহাড়ে । নাম ছিরিকুট । সেই পাহাড়ের ভিতরে একটা গহ্বর । গহ্বরের ধারে কোটি কোটি যুগের প্রাচীন মহানিমের গাছ । সেই গাছেই মহান এক কাক-পন্ডিতের বসবাস । বিশাল তাঁর উপাধি । শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিশ্চ কাককুলতিলক কাকস্যপরিবেদনাচার্য এম-এ, এম-কম, সমূহ বিশুদ্ধসিদ্ধান্তবাগীশ ন্যায়রত্ন । কাক-পক্ষীর জগতে ইনি দেবতার মত পূজ্য । বিয়ে, পৈতে, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ-শান্তি, মামলা-মোকদ্দমা, চুরি-চামারি, খুন-খারাপির বিচার-আচার ইত্যাদি সব ব্যাপারেই শিক্ষিত পরিবারের প্রাণীরা এক পা এগোয় না ওঁর সুপরামর্শ ছাড়া ।

চতুরাংশ্চু । এই চু-ডাইনেস্টি অনেককালের পুরনো । তবে চতুরাংশ্চু-র আগের কারো কথা কেউ জানে না । বংশের প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ যা ছিল উড়ে পুড়ে গেছে কবেকার কালবৈশাখীর ঝড়-ঝাপ্‌টায় । দ্রিঘাংচু-র আগে অবশ্য এই চু-ডাইনেস্টির নাম-ধাম কেউই জানতো না । তাঁর আমল থেকেই এই বংশের যত হাঁক-ডাক, কাক-পক্ষীর জগতে । বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, সমাজ কল্যাণে,দানে-ধ্যানে দ্রিঘাংচু ছিল এক অতুলনীয় চরিত্র । সেই দ্রিঘাংচু-রই জন্মশতবর্ষ এটা ।

সে-শতবর্ষ উৎসব যে কোন্ তারিখে পালন করা হবে তার দিনস্থির হয়নি এখনো ঠিকই, কিন্তু উদ্যোগ-আয়োজন চলেছে পুরোপুরি । আজ বিকেলে বাদুড় বাগানের একশো বছরেরও বেশি বয়স্ক বটগাছের মগডালে ডাকা হয়েছে বড় মিটিং । বড় জমায়েত হলে ঐখানে সভা ডাকাটাই রীতি । কলকাতায় যেমন মনুমেন্ট । এই বাদুড়বাগান কিন্তু কলকাতার বাদুড়বাগান নয় । কলকাতা থেকে অনেক অনেক দূরে । কত দূরে তা ম্যাপ ঘেঁটেও বলা যাবে কিনা সন্দেহ । কোলাঘাটের ব্রীজ, কাঁসাই নদী, বিষ্টুপুরের লাল বাঁধ, কলাইকুন্ডার এয়ারপোর্ট পেরিয়ে, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় ডিঙিয়ে আরো দক্ষিণে অনেক দূর গিয়ে পূবে বেঁকে পশ্চিমে ঘুরে উত্তরের দিকে কোনো এক জায়গায় । ঐ বাদুড়বাগানের গা ঘেঁসে মাছরাঙা নদী । নদীর পেট চিরে পানকৌড়ি খাল । সেই খালের এধারে ঝাউগিরি বন । ওধারে বাদুড়বাগান । বাদুড়বাগানটা সেকেলে শহরের



হরিশ্চ যে কবেকার তা কেউ জানে না। অনেকের ধারনা তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক। আবার অনেকের ধারনা তিনি ঐতিহাসিক নন, পৌরাণিক চরিত্র। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়কার। অন্য মত, তিনি রামায়ণের লঙ্কাকান্ডের সমসাময়িক।

লক্ষণ শক্তিশেলে অচেতন।
তাকে বাঁচাতে হনুমান ছুটলো যেদিকে গন্ধমাদন।
ভ্যাবাচেকা রাবণ হাঁকলেন, মামা গো মামা
ব্যাটা হনুমানের লম্ফ-ঝম্ফ থামা।
কালনেমি বললে, তার মানে তো যেতে হবে মরতে,
কিন্তু কি পাবো তার পরিবর্তে ?
রাবণ বললে, যদি সফল হয় হনুমান-বধ কার্য,
পাবে অর্ধেক রাজ্য।
সর্বাঙ্গে আলসেমি।
লঙ্কার কোন অংশটা পাকা, কোনটা কাঁচা
কোনদিকটা নিলে সুখশান্তির সোনার খাঁচা
তার সাতকান্ড ভাবতে ভাবতেই বেলা কাটিয়ে দিলে
কালনেমি।
তারপর রাক্ষসের বেশ ছেড়ে সাজলেন মুনি
গন্ধমাদনের কাছে আশ্রম খুলে জ্বালালেন ধুনি।
হনুমানকে দেখতে পেয়ে মগজে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি উৎপন্ন
বললেন, আমার কুটিরে দুমুঠো মাছ ভাতের নেমন্তন্ন।

এসব যখন ঘটছে তখন কাকুৎসু ঋষির চতুস্পাঠিতে হরিশ্চ বেদান্তের ছাত্র। যোগবলে টের পেয়ে গেলেন হনুমানকে মারার ফন্দী এঁটেছে কালনেমি। তখ্যুনি হনুমানের কাছে ছুটে গিয়ে হরিশ্চ কানে কানে জানিয়ে দিলেন ন গচ্ছামি নিমন্ত্রণং, শুন মন্ত্র!

হনুমান চম্‌কে উঠে বললে

—কেন? কেন?

হরিশ্চর সতর্কবাণী

—নিধনোদ্দেশে ষড়যন্ত্র।

হনুমান তখুনি বুঝে নিলে ব্যাপারটা। হরিশ্চর উদ্দেশ্যে করযোড় প্রণাম জানিয়ে বললে

—তথাস্তু।

হরিশ্চ নিজের চতুস্পাঠীতে উড়ে যাওয়ার আগে আশীর্বাদ জানাল হনুমানকে

—শুভমস্তু।

বাতাস চিরে ঘৃতাচু ছুটে চলেছে প্রাণপণে। তার ডানা নড়ছে হেলিকপটারের পাখার চেয়েও দ্রুত। আকাশ ঘোর লাল হয়ে গেলেই হরিশ্চ স্নানাদি সেরে বসে যাবেন জপে-আহ্নিকে। তখন কথা বলা তো দূরের কথা, দেখা করাই দুঃসাধ্যি। জপ-তপের আসন থেকে উঠবেন যখন, তখন গন্‌গনে দুপুর। ততক্ষণ অপেক্ষা করাও ঘৃতাচু-র পক্ষে সম্ভব নয়। এম-এ পাশ করে আড়াই বছর বেকার বসে থেকেছে অনেক এম-পি,

এম-এল-এ-র পায়ে তেল মালিশ করেও। গত বছরে শেষ পর্যন্ত জুটিয়েছে একটা স্কুল মাস্টারির চাকরি, কংকাশ পার্টির সভাপতির খোশ-নজরে পড়ে। নতুন চাকরির কাজে অবহেলা ঘটাতে সে অনিচ্ছুক।

যেতে যেতেই ঘৃতাচু টের পেল, কাছাকাছি এসে গেছে ঘাতকারণ্যের, বাতাসের ভিতরে মড়া-মড়া গন্ধ শুঁকে। ঘাতকারণ্যের ভিতরটা মরা মানুষের হাড়-কঙ্কালে বোঝাই, বাঘ-চিতাবাঘ-হাতি-ভালুক-সিংহ-শুয়োর-গন্ডার-অজগর লোকালয় থেকে মানুষ ধরে ধরে এইখানে এনেই মট্‌কে মট্‌কে খায় তাদের ঘাড়ের মাংস, হাড়ের রস, রক্তের সরবৎ। কিন্তু হাড় কি শুধু মানুষেরই ? বাগে পেলে কাক-পক্ষীদেরও ঘাড় মটকায় শিয়াল-শকুনেরা। তাই ঘাতকারণ্যের নাম শুনলে মানুষরাও যেমন তেঁতুল পাতার মতো কেঁপে ওঠে থরথরিয়ে, কাকপক্ষীদের বুকের ভিতরেও তেমনি ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো এপাশ-ওপাশ নড়তে থাকে না-জানি কি-জানি আতংক। সাবালক না-হয়ে ওঠা পর্যন্ত কাকপক্ষীদের তাই ওদিকে পা বাড়ানো বারণ। মানুষের ছেলেদের জন্যে যেমন আছে ঘুম-পাড়ানোর সেই 'বর্গী এল দেশে'-র ছড়া, কাক-পক্ষীর জগতেও তেমনি ছড়া আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাবধান করে দিতো —

ঘাতক বনে ডানা
মেলতে তোদের মানা

গেলেই হয়ে যাবি বাছা
শ্যাল-শকুনের খানা ।

ঘৃতাচু যখন হরিশ্চ-র আশ্রমে পৌঁছল, আকাশ তখন সবে পাকা জামরুলের আভা পাবে পাবে করছে । গায়ে নামাবলী জড়িয়ে হরিশ্চ পড়ছিলেন বটতলার মহাভারতের মতো একটা ঢাউস বই । ঘৃতাচু জানে কি বই সেটা । কাকভুশুণ্ডি রামায়ণ । ভুশুণ্ডি ছিলেন মহাতত্বজ্ঞানী অমর এক কাক । তারও আগে ছিলেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ । কাক-জন্ম পান লোমশ মুনির অভিশাপে । রাম-রাবণের যুদ্ধে রামের পক্ষপাতি ছিলেন আগাগোড়া । কাক-পক্ষীর জগতে তাঁরই লেখা এই রামায়ণ মানুষের সমাজের বেদ-উপনিষদ-গীতার মতো বড়ো মাপের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পাঠ্য ও পূজিত ।

ঘৃতাচুকে দেখে হরিশ্চর সম্ভাষণ

—এসো, এসো । তোমার কথাই ভাবছিলুম । উপবেশন কর । বগলে এত কাগজপত্রাদি কিসের ?

—আপনাকে দেখানোর জন্যে এনেছি । আপনি মানপত্রটা দেখে সংশোধন করে দেবেন বলেছিলেন । তার খসড়াটা এনেছি । আর আছে অনুষ্ঠান সূচী । সেটাও খসড়া ।

—অনুষ্ঠান সূচী ?

হরিশ্চ মহাজ্ঞানীদের মাপে মৃদু হাসলেন ।

—তোমরা তো দেখছি বিবাহের আগে ফুলশয্যা নির্মাণে ব্যস্ত । কবে অনুষ্ঠান তার দিন স্থির, অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান

অতিথি এবং অন্যান্য বক্তা নির্বাচন এসব কিছুই ঠিক না করে মানপত্র আর অনুষ্ঠান সূচী নিয়েই তোমাদের মতিচ্ছন্ন (মতি আচ্ছন্ন অর্থে)।

ঘৃতাচু মাথা নীচু করে বলে

—আজ্ঞে না, অনুষ্ঠান সূচী বানানো হয়নি। এটা একটা নামমাত্র খসড়া। কোন্ প্রোগ্রামের পর কি কি হবে, কার পর কে বলবেন, কটা গান ইত্যাদি ইত্যাদি এসব আপনি স্থির করে দিলেই আমরা যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর কাজে লেগে পড়ব।

—আচ্ছা। বেশ, অনুষ্ঠানের কি খসড়া বানিয়েছ পড়হ।

ঘৃতাচু একটু খ্য খ্য করে কেশে নিয়ে পড়তে শুরু করে

—প্রথমে উদ্বোধন সঙ্গীত। তারপর সভাপতি ও প্রধান অতিথি বরণ। তারপর···

—তিষ্ঠ! উদ্বোধন সঙ্গীতটা কি ?

—আজ্ঞে যা দিয়ে সভার উদ্বোধন করা হয়···।

—সে আমি জ্ঞাতব্য আছি। মনুষ্যসমাজে ওটার খুবই চলন্তিকা অধুনা। কিন্তু তোমাদের তো বিশ্বকবি বা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নেই। তোমাদের উদ্বোধন সঙ্গীতটা কি হবে অর্থাৎ কি গান, কি সুর, তার ভাষা কি এটাই ছিল আমার প্রশ্নাতীত (অতীতের অর্থাৎ একটু আগের প্রশ্ন হিসেবে)।

—উদ্বোধন সঙ্গীত আমরা একটা লিখিয়েছি স্যার।

—ওঃ লিখিত সমাধিত ?

—আজ্ঞা করলে শোনাতেও পারি।

ঘৃতাচু আবার খ্য খ্য করে কেশে নিয়ে পড়া শুরু করতে যাবার মুখে হরিশ্চ বললেন
—তিষ্ঠ ক্ষণকাল।
তারপরেই পশ্চিমদিকে বেঁকে ডাক দিলেন
—কাক্ষনি! কাক্ষনি!
অল্প পরেই কাক্ষনির প্রবেশ। কাক্ষনি হরিশ্চর বাড়ির দাসী হলেও দাসীর চেয়ে বড়। সেই-ই হরিশ্চর সর্বক্ষণের. পরিচর্যাকারিণী। বিধবা। না খেয়ে ফুটপাতে পড়ে মারা যাচ্ছিল। হরিশ্চ আশ্রয় দিয়ে তার হাতেই তুলে দিয়েছেন নিজের সংসারের ভার। কাক্ষনিরও প্রভু অন্ত প্রাণ।
—প্রভু!
—আমার চশমাটা। বাই-ফোকাল।
কাক্ষনি চলে গেল চশমা আনতে। হরিশ্চ ঘৃতাচুকে
—আজকাল চোখের দৃষ্টি বেশ ক্ষীণপ্রভ। হ্যাঁ, আমরা কি আলোচনা করছিলুম যেন।
—উদ্বোধন সঙ্গীত।
—হ্যাঁ, হ্যাঁ। উদ্বোধন সঙ্গীত। দেখ, হারমনিয়ম আর ডুগি-তবলা বাজিয়ে এই যে সভা সমিতির উদ্বোধনটা চালু হয়েছে, এটা খুবই বিরক্তিপাদক (বিরক্তি উৎপাদক অর্থে)। এতে এমন একটা আবহাওয়া তৈরী হয়, যা কোনো গুরু-গম্ভীর অনুষ্ঠানের পক্ষে মানানসই নয় কোনোক্রমেই। আমাদের ছাত্র জীবনে প্রচলিত ছিল বেদগান ও স্তোত্র পাঠ। তখন

মনে হতো যেন আকাশ ও পৃথিবী সব একাকার। মর্ত ও স্বর্গ প্রভেদহীন। আমরা অনন্তের মধ্যে। ঋষিকণ্ঠের বেদগান বা স্তোত্র পাঠ অধুনা পৃথিবী থেকে নির্বাসিত। পরিণামে কোনো মহাপুরুষের উদ্দেশে স্মরণ সভা ও পাড়ার ক্লাবের বার্ষিক উৎসবে ভেদাভেদ লুপ্ত। সে যাই হোক, আমি তোমাদের উদ্বোধন সঙ্গীতে কোনো বাধা প্রদানে অনিচ্ছুক। তুমি সঙ্গীতটি পাঠ করহ।

ঘৃতাচু পড়া শুরু করলে।

—তাল ঝিঁঝিট। এক তালা।

ওই শুন পুনঃ পুনঃ উঠে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
কোথায় দ্রিঘাংচু আজি, ধর্মপ্রাণ চূড়ামণি।
সে যে শুধু জ্ঞানী নয়, পরম মণীষাময়
দিগন্তে উজ্জ্বল রত্ন মহত্ত্ব রতন-খনি।
বিশ্বপ্রেম বুকে লয়ে, বিশ্বপ্রেম বিনিময়ে
যত কথা গেছে কয়ে, একে একে কত গণি।
কেন মিছে কাঁদা আর, কেন বা বেদনা-ভার
নাহিক জীবন তার, আছে তো তার জীবনী।

পাঠের মাঝখানেই কাক্ষনি চশমা এনে দাঁড়িয়েছিল। পাঠ শেষ হতেই হরিশ্চ চশমাটা পরে ঘৃতাচুর দিকে হাত বাড়ালেন। ঘৃতাচু তার হাতের কাগজটা এগিয়ে দিল। কাগজে একটু চোখ বুলিয়েই হরিশ্চ দুর্বশা মুনির মতো ভস্ম করার আগের কটোমটো চোখে ঘুরে তাকালেন ঘৃতাচুর দিকে।

—কে লিখেছে এ উদ্বোধনী সঙ্গীত ?
—আজ্ঞে, আমাদের পাড়ার জনৈক তরুণ কবি । ফৌজ্য ।
—চৌয্য । এটু চুরি করা । অপহরণ । ইংরেজিতে যাকে বলে প্লেজিয়ারিজম । বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরলোকগমন করলে ২২শে ভাদ্র ১৩১৯ শুক্রবার অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় কলিকাতার টাউন হলে তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্যে যে মহতী সভা হয়, সেস্থলে গীত হওয়ার জন্যে এই গানটি লিখেছিলেন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক বিহারীলাল সরকার । বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে প্রথমে সঙ্গীতচার্য সুকণ্ঠ দেবকণ্ঠ বাগচী মহাশয় ভক্তি গদ্‌গদ্‌ চিত্তে গানটি গাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । তোমাদের চৌয্য কবি ফৌজ্য ছোকরাটি নামমাত্র দু-একটি শব্দের অদল-বদল ঘটিয়ে সেটিতেই গছিয়ে দিয়েছে তোমাকে ।
—স্যার, ক্ষমা মার্জনীয় । আপনার জ্ঞান-পরিধির তুলনায় আমি দুগ্ধপোষ্য । আমার বিদ্যাবুদ্ধি সীমিত । তদুপরি আমি স্যার, কাকতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম-এ ।
—অনুমেয় । এক্ষণে শিক্ষার অধঃপতনে সত্য সত্যই সততই আমি দুঃখভারাক্রান্ত । স্মৃতি সততই সুখের নহে । আমাদের সমকালীন চতুষ্পাঠী ও অদ্যকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জ্ঞান-বিতরণের কী বিসদৃশ্য পার্থক্য প্রত্যক্ষগোচর । গতস্য শোচনা নাস্তি ঠিকই । কিন্তু মদীয় সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতির

নিপাতনে-সিদ্ধ দশম-দশা দর্শনে অবিচলিত থাকা অসংগ্‌ভব (অসংগতরূপে অসম্ভব)। সে যাহা হউক, উদ্বোধন সঙ্গীতের কথায় আইস। প্রথম, গানটি অপহৃত। দ্বিতীয়ত এ গানে কোথাও তোমার পিতামহের চরিত্রের সঠিক চরিত্র অনুপস্থিত। তৃতীয়ত গানটির শেষ পংক্তিতে রয়েছে 'নাহিক জীবন তার আছে তো জীবনী'। ইহা কি সত্য ? তোমার পিতামহের জীবনী কি গ্রন্থরূপে পুস্তকালয়ে বা পাঠাগারে সুলভ ?

—আজ্ঞে না, তাঁর জীবনী না থাকার জন্যই তো আমরা শতবর্ষের অনুষ্ঠান সূচীতে একটি প্রস্তাব রাখতে চাইছি যে, শতবর্ষ উদ্‌যাপনের বছরের মধ্যেই যোগ্য ঐতিহাসিক ও গবেষকদের দ্বারা তাঁর একটি সুলিখিত জীবনী প্রকাশের উদ্যোগ।

—উত্তম। এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপনে অভিলাষী। জাতীয়তাবাদের পোষকতা ক্ষতিকারক। কিন্তু জাতীয়তাবোধের হীনতা বা দীনতা অধিক ক্ষতিকারক। অধুনা কাক-পক্ষীর জগতে মনুষ্য সমাজের ভাষা ও ভঙ্গীর প্রবল অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারে আমি আগ্রহাচিন্তিত (আগ্রহ সহকারে চিন্তান্বিত)। কাক-জগতের নিজস্ব ভাষা-ভঙ্গী ক্রমশই বিলোপের দিকে। বিলাপই সম্বল, যেহেতু সে লুপ্তরত্নোদ্ধার দুরাশা। তোমরা যদি যথার্থই আমার সুপরামর্শে আস্থাবান হও, তাহা হইলে উক্ত উদ্বোধন সঙ্গীতটিকে আপদমস্তক পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও পরিমার্জন বিষয়ে আমি কিছু সাজেশান



প্রদানে ইচ্ছুক। মদীয় প্রথম সাজেশসান, উদ্বোধন সঙ্গীতটির সংক্ষিপ্তকরণ। তুমি প্রশ্ন করিবে কেন ? আমার উত্তর, আদর্শ কাক, বিশেষত দাঁড় কাকেরা, সব সময়েই সংক্ষিপ্ত ভাষণে অভ্যস্থ ও পারঙ্গম। কাক-ভাষা মূলত বাক্য-ভয়ঙ্করী। অর্থাৎ অল্প বাক্যে ভয়ঙ্কররূপ বিষয় ব্যক্ত করিতে সক্ষম। মনুষ্য সমাজ যে-কারণে কাক-ভাষার প্রতি এতখানি আগ্রহী। এবং ইতিমধ্যেই তাহারা মদীয় ভাষার বহু মণিমুক্তা কাজে লাগাইয়াছে নিজ ভাষার রত্নহার গঠনে। অন্য কোনো দিন অবসর থাকিলে তুমি আমার নিকট আগমনপূর্বক আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নামক গ্রন্থের ক-বর্গের পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া গেলেই আমার বক্তব্য সম্বন্ধে সম্যক্ অভিজ্ঞতাবান হইয়া উঠিবেক।

এমন সময়ে কাক্ষনির প্রবেশ। হাতে কাচের গেলাসে সবুজ পানীয়।

—প্রভু ! আপনার প্রাতঃকালীন পিত্তনাশক পানীয়।

হরিশ্চ হাত বাড়ালেন সেই গেলাসের দিকে। দৈনন্দিন অভ্যাসবশত তৎক্ষণাৎ পানপাত্রটি মুখে তুলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি। ঘৃতাচুর দিকে তাকিয়ে বললেন

—আমার হস্তে কি দেখিতেছ ?

—কাচের গেলাস।

—গেলাস মধ্যে ?

—সবুজ বর্ণের পানীয় ।
—কোন্ বস্তুর দ্বারা নির্মিত ?
ঘৃতাচু চুপ্ ।
—কিয়ৎক্ষণ আগে তোমাকে বলিতেছিলাম যে মনুষ্যসমাজ মদীয় কাক-ভাষার মূল্যবান বহু কিছুই আত্মসাৎ করিয়াছে । কিন্তু তাহারা শুধু ভাষাই আত্মসাৎ করে নাই । অন্যান্য মহৎ ও আশু ফলপ্রদায়িনী আহার্য্য বিষয় গলাধঃকরণ করিয়াছে যথেষ্ট তৎপরতার সহিত । গত কয়েক অযুত-নিযুত বৎসর আমি এই মহা নিম গাছটির বাসিন্দা । প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক গেলাস নিমপাতার রস শ্বাশ্বতকালব্যাপী আমার দৈনন্দিন আহার্য্য ।

যেভাবেই হউক, এই সমাচার কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে কলরব ও কথোপকথনপ্রিয় কাকেদের মারফৎ পৌঁছে যায় । তথায় তখন বসবাস করতেন মনুষ্য সমাজের অন্যতম বিশ্বকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তিনি তাঁর ভ্রাতস্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো কাক-ভাষায় যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞ ছিলেন । নিমপাতার রস দীর্ঘ জীবনপ্রদায়িনী এই তথ্য আহরণের পরই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত নিমরসপানে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন । এবং ক্রমে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করেন । অথচ ঐ নিয়মিত নিমরস পানের আগে তিনি যে শরীরে ও মনে কী পরিমাণ দুর্বল ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর নিমরস পানের অব্যবহিত পূর্বের কবিতাগুলি । একটি কবিতাগ্রন্থের নামেই তো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ভগ্নহৃদয় । ইহা

১৮৮১ সালের রচনা। অর্থাৎ কবির বয়স তখন মাত্র কুড়ি। হরিশ্চ থামলেন। এবং এক চুমুকে গেলাসের সমস্ত রস পান করে গেলাসটি অপেক্ষামান কাক্ষনির হাতে ফিরিয়ে দিলেন। কাক্ষনি চলে গেল। হরিশ্চর ঠোঁটের কোনো কিছু রস লেগে ছিল। তিনি সেটা নামাবলী দিয়ে মুছে নিলেন। তারপর তাঁকে কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে চুপচাপ করে থাকতে দেখে ঘৃতাচু বললে

—তাহলে...

হরিশ্চ চোখ খুলে তাকালেন।

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সুশীলকুমার দে। তোমাকে ক্ষণিক পূর্বে বলেছিলাম হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষের কথা। আরও একটা বই-এর নাম বিস্মৃত হয়েছিলাম তখন। সুযোগ পেলে সুশীলকুমার দে-র 'বাংলা প্রবাদ' বইটাও নেড়ে-চেড়ে দেখলে বুঝবে বাংলা ভাষা কাক-সমাজের বিশেষ করে শিক্ষিত দাঁড়কাক সমাজের অভ্যন্তর থেকে অপহরণ করেছে কত কী। কয়েকটা নমুনা শোনাই—

কাকের ছা বকের ছা।

কাকেরও ডিম সাদা হয়, বিদ্বানেরও ছেলে গাধা হয়।

কাকের ডাকে মূর্চ্ছা যায়, রাত্রে নদী পার হয়।

কাকের বাসায় কোকিল হল, দিন পেয়ে সে উড়ে গেল।

কাকের ভাত রাখা।

কাকের মুখে কৃষ্ণ কথা।

কাক কোকিল একই বর্ণ, কিন্তু স্বরে ভিন্ন ভিন্ন।
কাক-নিদ্রা।
কাক-স্নান
কাক-জ্যোৎস্না।
কাক-বন্ধ্যা।
কাকের মুখে সিঁদুরে আম।
কাকের পিছে ফিঙে লাগা।
এরকম আরো অনেক আছে। মজা কি জান ? মনুষ্যসমাজ কাকের কাছ থেকে যা নিয়েছে তা যদি যথার্থ অনুশীলন করতো, মনুষ্যসমাজের অর্ধেক দুঃখ লাঘব হয়ে যেতো অর্ধেক শতাব্দী আগে। যেমন ধরো, 'কাক কাকের মাংস খায় না'-এই প্রবাদটার কথা। এটা যদি মানুষরাও মানতো তাহলে আর এত যুদ্ধ-দাঙ্গা-সাম্প্রদায়িকতা-বিচ্ছিন্নতাবাদ-খুন-খারাপি, ন্যাশনাল ইনটেগ্রিটির সমস্যা-টমস্যা কোনোটাই ঘটতো না। যাক গে এসব কথা। মনুষ্যসমাজের গেরো নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আমরা বরং উদ্বোধনী সঙ্গীতটার বিষয়ে ভাবি। হ্যাঁ। ওটাকে বদলাতে হবে। আচ্ছা আমি বলে যাচ্ছি। তুমি লেখ। কাগজ-কলম আছে না দেবো ?
—কাগজ আছে। কিন্তু কলম নেই।
হরিশ্চ তখুনি হাঁক পাড়লেন
—কাক্ষনি ! কাক্ষনি।
কাক্ষনি তৎক্ষণাৎ হাজির।

—কাক্ষনি ! আমার ড্রায়ার থেকে একটা ডট্‌পেন ।
কাক্ষনি ডট পেন এনে দিল হরিশ্চকে । হরিশ্চ দিলেন
ঘৃতাচুকে ।
—লেখ ।
কাক-সমাজের প্রণম্য তুমি, কাক-সমাজের প্রতিভূ
বন্দি তোমার দ্রিঘাংচু ।
আমরা যখন ক-এ গোমাংস
প্রদানিলে তুমি জ্ঞানের চাঙ্গো
তোমার দানের গৌরবাংশ
আমাদের না-কে করেছে হুঁ ।
বন্দি তোমার দ্রিঘাংচু ।
এর বেশি লিখবার দরকার নেই । কাক-ভাষা হিন্দুস্থানী গানের মতো ইলাসটিক । অল্প সম্বলকেই টেনে বাড়িয়ে অমৃতসমান করে তোলা যায় । এবার অনুষ্ঠানসূচীতে এসো । আমার হাতে আর বেশি সময় নেই । আকাশ জবাকুসুম হওয়ার মুখে । কাকে সভাপতি করতে মনস্থ করেছ তোমরা ।
—আজ্ঞে, এ নিয়ে দুটো মতভেদ । এক পক্ষ, যারা তরুণ, আমাদের সমবয়সী,তারা চাইছে বাবু সুকুমার রায়কে সভাপতি করতে । অন্যপক্ষ, যারা বৃদ্ধ-বয়স্ক, তারা বলছেন সভাপতি করা হোক উপন্যাসাচার্য্য কাকুৎস্য কাক-রত্ননিধিকে, যিনি গত বছর সম্মানিত হয়েছে জ্ঞান পঞ্জর পুরস্কারে ।
—আমার মতে কাকুৎস্যকে তোমরা প্রধান অতিথি কর ! কিন্তু



সভাপতি হিসেবে বাবু সুকুমার রায়ই শ্রেষ্ঠ নাম। কারণ এটা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে তিনিই প্রথম বিশ্বে ছাপার অক্ষরে মনুষ্য সমাজে তোমার পিতামহের নাম ও গুণগান প্রচারে উৎসাহী হন। তোমার পিতামহের জীবনের যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ, সমাজ কল্যাণব্রত, সেটি বাবু সুকুমার রায়ের ঐ ক্ষুদ্র কাহিনীতে সুস্পষ্টরিবেশিত (সুস্পষ্টরূপে পরিবেশিত)। এমন কি খাঁটি কাক-বিজ্ঞরূপে তিনি যে মন্ত্রবৎ স্বল্পভাষী ছিলেন, সেটাও পরিস্ফুটিত করে দিয়েছেন তাঁর কাহিনীতে। তাঁর গল্পে তোমার পিতামহের মুখে তিনি একটি বৈ দুটি শব্দ বসান নি। কি সেই শব্দ, যা মহাবাক্যবৎ ?কঃ। এত সংক্ষেপে ইতিপূর্বে আর কোনো মহাপ্রশ্ন পৃথিবীতে উচ্চারিত হয়নি। প্রশ্নটি বহুমুখী। এর মর্মাথ এইরূপ—কঃ অর্থাৎ হে মহারাজ, দেশ দারিদ্র্য-পীড়িত আপনি কি পন্থা অবলম্বন করার কথা ভাবছেন ?

আবার অন্যভাবে,

কঃ অর্থাৎ প্রজাবৃন্দ যখন যৎপরনাস্তি দারিদ্র্য দোষ গুণরাশি নাশি রোগে আক্রান্ত, তখন কি রাজসুখে কালাতিপাত আপনার পক্ষে ঔচিত্য ?

এ ছাড়াও রয়েছে আরও নিগূঢ়াৎপর্য (নিগূঢ় তাৎপর্য)। কঃ অর্থাৎ হে মহারাজ, তুমি কে, কি তোমার জীবনের সার্থকতা, যদি না প্রজাসুখে জীবন উৎসর্গে অনিচ্ছুক ? বাবু সুকুমার রায় অতি সংগোপনে আরও একটি মহৎ সত্যের

হরিশ্চ ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। এই সময় তিনি মুখে কোনো কথা বলেন না।

উত্তরে ঘাড় নাড়লেন কেবল।

অর্থাৎ হ্যাঁ।

ঘৃতাচু হাত ঘড়িটা দেখে নিল। প্রায় সাতটা। না খুব বেশি দেরি হয় নি। বাড়ি ফিরে স্নান করে খেয়ে-দেয়ে মাস্টারীতে পৌঁছনো যাবে ঠিক সময়েই।

কাগজপত্র গুছিয়ে ঘৃতাচু ডানা ছড়াল আকাশে। আকাশটাকে তার আজ ভালো লাগলো খুব। এ-রকম কুসুম-কুসুম উত্তাপের আকাশে অনেকদিন ওড়ে নি সে।



আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছেন তাঁর ঐ ক্ষুদ্র কাহিনী মধ্যে। কঃ শব্দটি গ্রীক বা ল্যাটিন বা চীনে ভাষা নয়। খাঁটি সংস্কৃত। তোমার পিতামহ সংস্কৃত ভাষায় ছিলেন বিশেষ বুৎপন্ন। অথচ রাজসভার মহাপন্ডিতেরা যৎসামান্য সংস্কৃতজ্ঞানেও নিরূপাক্ষম (নিরূপায়রূপে অক্ষম)। এই প্রসঙ্গে তোমাকে আমার জ্ঞাতব্যকরণ উচিত যে, একদা যে-মনুষ্যসমাজ কাক-ভাষা হইতে প্রভূত সম্পদ অপহরণ করিয়াছিল, অদ্য সেই মনুষ্য-সমাজই তাহার অর্থ-উদ্ধারে অপরাগ। কাক-ভাষার দুই রূপ। তৎসমবৎ। ওতদ্ভবমৎ। তৎসমবৎ প্রধানত সংস্কৃত নির্ভর। তদ্ভবমৎ হইল যে মত তৎসম হইতে উদ্ভুত। মনুষ্যসমাজ কাক-ভাষার তৎসমবৎ হইতে যে সমস্ত প্রবাদতুল্য বাক্য নিজ ভাষায় আত্মসাৎ করিয়াছে তার একটি উদাহরণ, শুনহ।

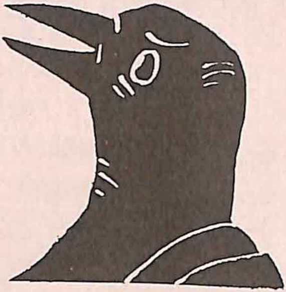
কা তব কান্তা, কাস্তে পুত্র।

এখানে পর পর তিনটি কা অক্ষরের সমাবেশই প্রমাণ করে দেয় যে এটি আদতে কাক-ভাষায় রচিত। আর তদ্ভবমৎ হইতে...

হরিশ্চ· কথার মাঝপথে থেমে গেলেন। কারণ আকাশ রক্তবর্ণ।

ঘৃতাচুর মনে পড়ল, মানপত্রের খসড়াটি এখনো শোনানো হয়নি তাঁকে।

—স্যার, মানপত্রের খসড়া নিয়ে কি তাহলে কাল সকালে...



২

অডিয়েন্সরা হাজির
সভাপতি সিটিঙ
তবু কেন হয় না শুরু
ঠিক সময়ে মিটিঙ ?

এক ফিচেল ফিঙে এই ছড়া কাটতেই, যেন ঝমঝমিয়ে হঠাৎ বৃষ্টি, এইরকম হাসিতে বাদুড়বাগানের একশো বছরের পুরনো বটগাছের ডালগুলো কেঁপে উঠলো দুলে দুলে। বা বলা যেতে পারে ডালে ডালে কেঁপে উঠলো মিটিঙে হাজির শ্রোতারা। শতকরা আশি ভাগ কাক-পক্ষীই হাজির। তবু সভা আরম্ভে বিলম্ব হচ্ছে দেখে শ্রোতাদের মতো সভাপতিও ঈষৎ বিরক্ত। সভাপতির আসনে প্রৌঢ় কাকাতুয়া অদাঙ্ক। কাক-পক্ষীর জগতে ইনি অন্যতম এক সর্বজনপূজ্য বুদ্ধিজীবী। অধুনা সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক যে কোনো রকম প্রগতিশীল

সভাসমিতির বাঁধাবরাদ্দ সভাপতি ইনিই। অকল্পনীয় ধরনের প্রাজ্ঞ মানুষ। বিশ্ব-পর্যটন করেছেন বহুবার। সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই দক্ষ। আদি-যৌবনে লিখেছেন কবিতা।
মধ্য-যৌবনে গল্প-উপন্যাস। অন্ত-যৌবনে প্রবন্ধ। প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়ে বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদে ব্যস্ত। খুবই যুক্তিপ্রবণ মানুষ। ঘোর লজিক্যাল। সভাপতির আসনে নীরবে চুপচাপ বসে থাকায় তিনি মনে মনে যৎপরনাস্তি বিরক্ত। তার সেই বিরক্তি ফাজিল ফিঙের রসিকতায় আরো বেড়ে গেলে কার্যকরী সমিতির জনৈক সদস্যকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন তিনি।

—শোনো, শোনো।

সদস্য কাছে আসতেই

—তোমাদের সভা আরম্ভ হওয়ার কথা বিকেল সাড়ে চারটেয়। এখন (কথা থামিয়ে হাতঘড়ি দেখে নিয়ে) পাঁচটা বাজতে তিন মিনিট। সভার লোকজনও যথেষ্ট পরিমাণ হাজির। তাহলে শুরু হচ্ছে না কেন ? আর যদি শুরু না হবে তাহলে শুরু করার নির্দিষ্ট সময়টা ঘোষণা করেছ কেন হ্যান্ডবিলে বা বিজ্ঞাপনে ?

সদস্যটি কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দেয়

—আমি জানি না ঠিক। ঘৃতাচুদাকে ডেকে দিচ্ছি বরং।

সদস্য এই বলে সট্‌কে পড়ার পর উত্তর দিক্ থেকে কে যেন ছড়া কাটে-

গুরু

আপনি ভাষণ করে দিন শুরু ।
ঘৃতাচু এই সময়ে গাংশালিক পাড়ার এম· এল· এ কুঞ্জুরুর সঙ্গে কথা বলছিল সভাপতি অদাঙ্ক-র ঠিক পিছনে, তবে খানিকটা দূরে । ছুটে আসা সদস্যের মুখে অদাঙ্কের অস্থিরতার খবর পেয়ে সেও বাকি কথাটা সেরে নিয়ে হন্‌হনিয়ে ছুটে এসে অদাঙ্কর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে—
—স্যার, ক্ষমা করবেন, খুব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম । উত্তর পাড়ার বাসিন্দেরা জোট পাকিয়েছে, কার্যকরী সমিতিতে তাদের অর্থাৎ গাংশালিক সমাজের কাউকে কার্যকরী সমিতির সদস্য মনোনয়ন না করলে তারা এই শতবর্ষ উদ্‌যাপন উৎসব বয়কট করবে । চাঁদা-ফাঁদাও দেবে না কড়া-ক্রান্তি । মুশ্‌কিল কি জানেন স্যার, ওরা সরে দাঁড়লে সত্যি সত্যিই শতবর্ষ উদ্‌যাপন লাটে উঠবে ।
—সে তো বুঝেছি । তা এখন সমস্যাটা ঠেকেছে কোনখানে ?
—না স্যার, আর ঠেকে নেই । মোটামুটি ম্যানেজ । আসলে আমরা চাইছিলাম কুঞ্জুরুকে । কিন্তু কুঞ্জুরু কিছুতেই রাজী নয় । সে বলছে তক্ষ-কে নাও ।
—তা নিলেই তো পার ।
—নেওয়ার কিছু অসুবিধে আছে স্যার । তক্ষের নামে অন্তত কমপক্ষে, ছটা ছিনতাই, আটটা রাহাজানি, গোটা বারো ডাকাতি, আর কুড়ি পঁচিশটা আরো খারাপ ব্যাপারের মামলা ঝুলছে । এমন লোককে কার্যকরী সমিতিতে ঢোকাই কি করে

বলুন তো ?

—তা তো ঠিকই। তাহলে ?

—মোদ্দা ব্যাপারটা আপনাকে বলি। তক্ষ এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ। তার উপরে কাংকাশ পার্টির সঙ্গে তার দারুণ দহরম-মহরম। টাকা পয়সাও জমিয়েছে অঢেল। কুঞ্জুরু এখন নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইছে তক্ষের মেয়ের। এর পিছনেও স্যার দুটো উদ্দেশ্য। এখানে কার্যকরী সমিতির সদস্য করে দিয়ে গুঞ্জুরু চাইছে তক্ষকে জাতে তুলতে। ওদিকে সামনের মাসে ইলেকশন। কুঞ্জুরু আবার দাঁড়াতে চায় এম-এল-এ হবার জন্যে। তক্ষের ম্যান পাওয়ারের সাহায্য না পেলে দাঁড়ানো অসম্ভব।

—তা শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্তে পৌঁছলে।

—আজ্ঞে, ভেবে দেখলাম আমরা, তক্ষের নামটা গিলতেই হবে।

—গিলতে হবে না গিলে ফেলেছো ?

—আজ্ঞে গিলেছিই বলতে পারেন।

—তাহলে তো সমস্যা মিটে গেছে। এখন কি সভা শুরু হবে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমি কি তাহলে শুরু করতে পারি ?

—সার্টেনলি।

অদাঙ্ক উঠে দাঁড়ালেন। বাহাত্তরে পা-দেওয়া প্রৌঢ়। চুল



পাকা। গাল ভাঙা। চোখে ইষৎ কম, কানে কিঞ্চিৎ খাটো।
কিন্তু বাংলা মূর্ধণ্য ন-এর লম্বা দাড়ির মতো খাড়া
মেরুদণ্ডওয়ালা। নিজের আসন থেকে সোজা উঠে গেলেন
মাইকের সামনে।
—বন্ধুগণ, আমি সভার শুরু ঘোষণা…
বাদুড়বাগানের বটগাছ-বোঝাই শ্রোতা এক যোগে চেঁচিয়ে
উঠল তৎক্ষণাৎ—
—লাউডার পিলিজ।
অদাঙ্ক বুঝতে পারলেন মাইকটা চলে নি, বন্ধ। ঘৃতাচুও বুঝতে
পেরে তখুনি তিন লাফে ছুটে এসে দাঁড়াল সভাপতির
কাছাকাছি। তারপর গলা খুলে ডাকাডাকি
—মাইকম্যান। মাইকম্যান।
দেখা গেল অনেক দূর থেকে ছুটে আসছে মাইকম্যান। সভা
শুরু হতে দেরী আছে দেখে সে পান-বিড়ি-সিগারেট কিনতে
গিয়েছিল। মাইকম্যান মাইকের সুইচ টিপে ঘৃতাচুকে বললে
—স্যার, অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল। আরেকবার মাইক-টেস্‌টিংটা
করে নি।
হ্যালাও—হ্যালাও—হ্যালাও
মাইক টেসটিংটা করে ফ্যালাও।
ওয়ান—টু—থ্রি—ফোর—ফাইভ—সিক্‌স
বাঃ ভালোই তো শোনাচ্ছে এ্যাকসটিকস।
সেভেন—এইট—নাইন—টেন।

মাইক রেডি, এখন লেকচার শুরু করতে পারেন।
সভাপতি মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন আবার।
—বন্ধুগণ, আমি সভার কাজ শুরু করছি।
এখন কার্যকরী সমিতির পক্ষ থেকে কাক্ষ আপনাদের সামনে তাঁর বক্তব্য রাখবেন। কথাটা শেষ হওয়ামাত্রই অল্প দূরে চাপা হট্টগোল। সভাপতি ধমক দিয়ে বললেন।
—এত হট্টগোল কিসের ?
—হট্টগোলের দিক থেকে আওয়াজ এল
—যুৎসু কিছু বলতে চায়।
—বলতে চায় তো উঠে দাঁড়িয়ে বলুক।
ছোকরা যুৎসু বুক টান করে দাঁড়াল।
—মাননীয় সভাপতি মহাশয়, একটু আগে আপনি যে বক্তব্য রাখার কথাটা বললেন, আমার হামবল প্রশ্ন, আমি যেহেতু আপনাদের মতো লারনেড নই, তো কথাটা কি শুদ্ধ ? বক্তব্য কি শালপাতার ঠোঙায় গরম কচুরি, না কি বিয়ে বাড়ির দইয়ের হাঁড়ি যে তাকে এখানে-সেখানে রাখা যাবে। একমাত্র কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায় আর রাজনৈতিক বক্তৃতাবাজেরা ছাড়া অমন অশুদ্ধ বাক্য ভূ-ভারতে কেউ ব্যবহার করে না। মাননীয় সভাপতি মহাশয় যদি কলকাতার নকল না করে খাঁটি কাক-ভাষায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেন তো আমরা উপকৃত হই।
যুৎসু থামতেই রামলীলার কত্তালের মতো ঝমঝমিয়ে উঠল

হাততালি। সভাপতি মহাশয় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলতে লাগলেন

—যুৎসুর যুক্তিগুলো বেশ যুৎসই। আমরা শুনলাম। কিন্তু একমত হতে পারলাম না। একটা সজীব ভাষা, অন্য বহু ভাষা থেকে হরেক জিনিষ হজম করে নেয় নিজের প্রয়োজনে। এক্ষেত্রে চুরিবিদ্যাটাই মহাবিদ্যা, এমনকি ধরা পড়লেও। আমাদের মনে রাখা দরকার যে গত একশো বছরে হাতী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, মহিষ প্রমুখ জাঁদরেল প্রাণীদের ভাষা এক চিল্‌তেও এগোয় নি। কিন্তু কাক-পক্ষীদের এগিয়েছে। কারণ কাক-পক্ষীরা মনুষ্য সমাজের নিকটতম প্রতিবেশী। মনুষ্য সমাজের সঙ্গে তাদের নিবিড় যোগাযোগ। গ্রাম-বাংলা এবং শহর কলকাতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ফলেই আমাদের মৌলিক ভাষায় ঘটে চলেছে নিয়ত রূপান্তর। কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে হোপ '৮৬ নামক প্রমোদ-উৎসব হয়েছে মাত্র মাসখানেক আগে। ইতিমধ্যেই তা কাক-পক্ষীর ভাষায় সংক্রামিত। অল্প কয়েকদিন আগে আমি একটি বানরশিশুকে হুপ-হাপের বদলে হোপ্‌-হাপ বলতে শুনেছি। এটাই স্বাস্থ্যকর, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সজীবতা রক্ষায়। এ নিয়ে অধিক বাক্‌-বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন। আমি এখন কাক্ষকে আপনাদের সামনে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে আহ্বান জানাচ্ছি।

সভাপতি ফিরে গেলেন নিজের আসনে। কাক্ষ এসে চেপে

ধরলেন মাইকের খুঁটি । ঝোড়োকাকের মতো চেহারা । কিন্তু পরহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই মানুষটি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ।

গানের আসরে গান শুরুর আগে মাইক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ওস্তাদ গাইয়েদের কেশে-নেওয়ার ভঙ্গীতে একটু খুক্-খুক্ কেশে নিয়ে কাক্ষ বলতে শুরু করলে

—বন্ধুগণ ! আপনারা সকলেই জানেন এ বছর অর্থাৎ এই ১১৮৩ কাক-অব্দে আমরা মহান কাক-পুরুষ দ্রিঘাংচু-র জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন করতে চলেছি । যেহেতু এ জাতীয় বৃহৎ কর্মকাণ্ডে আমাদের এই প্রথম ডানাক্ষেপ, তাই নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক । গত মাসের মিটিঙে আমরা আপনাদের সামনে কার্যকরী সমিতির সদস্য তালিকার নামগুলি পড়ে শুনিয়েছিলাম । আমাদের অনবধানবশত সে তালিকার গাংশালিক সমাজের পক্ষের কোনো প্রতিনিধির নাম ছিল না । আজ আমি আপনাদের সামনে ঐ সমাজের পক্ষ থেকে নির্বাচিত সদস্যের নামটি ঘোষণা করছি । তিনি হলেন তক্ষ ।

চতুর্দিকজুড়ে রব উঠল—

সাধু ! সাধু !

সমাবেশের উপরে উপরে যখন এই সমর্থন, ভিতরে ভিতরে তখন চলেছে অন্যরকম কানাঘুসো, ফিস্‌ফাস্, গুজ্‌গাজ । টুনটুনি ফিঙেকে

—শুনলে কি নাম বললে ? তক্ষ ।
ফিঙে টুনটুনিকে
—মাস্তানীতে মস্ত দক্ষ ।
ঘুঘু ফিঙেকে
—চোরাই-চালান, গাবদা টাকা ।
টুনটুনি ঘুঘুকে
—খুন-খারাপির হাতটি পাকা ।
শালিক মাছরাঙাকে
—লেখাপড়ায় মা গঙ্গাটি ।
মাছরাঙা দোয়েলকে
—আজ এ পার্টি, কাল সে পার্টি ।
দোয়েল ফিঙেকে
—মুখে সমাজতন্ত্র বুলি
ফিঙে শালিককে
—হাতে বন্দুক, ঠাসা গুলি ।

কাক্ষ-র কথা তখনো শেষ হয় নি । সাধুবাদের রেশ থামতেই আবার তার গলা ।

—আমি এখন তক্ষকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে আহ্বান জানাচ্ছি ।

টেরিকটনের পাঞ্জাবীতে চেকনাই নকসা । সাদা পাজামা । গলায় সরু সোনার হার । কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের টিপ । একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো । মুখে পান । তাই



গালের একটা পাশ ফোলা। তক্ষ এসে দাঁড়ালেন মাইকের সামনে।
—নমোসকার। আমি আজ এই শতবর্ষ পার্টির মেম্বার হতে পেরে নিজেকে গ্লোরিয়াস মনে করছি। মেম্বার যখন হয়েছি, শতবর্ষ পার্টির জন্যে জান লড়িয়ে দুবো। আমার ছেলেরাও জান লড়িয়ে দেবে। এই শুভকাজে যদি কোনো অপজিশন আসে, তুবড়ি হয়ে যাবে। আর চাঁদা-ফাঁদা নিয়ে আপনারা ভাববেন না। কি করে চাঁদা আদায় করতে হয় সে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি আমার কালী পুজোয়। যাকে যা সিলিপ ধরিয়ে দুবো, সে ঘাড় গুঁজে দিয়ে যাবে। না দিলে লাস গড়াগড়ি খাবে শ্যাওড়াতলার শ্মশানে। এইটুকু বলেই আজকের মতো শেষ করছি আমার স্পিচ্। আপনারা আমার বিপ্লবী অভিনন্দন লিবেন।
আবার হাততালি ও সাধু সাধু রব।
এরপর সভাপতি ঘোষণা করলেন, ঘৃতাচু যোগ করবে তার সঙ্গে হরিশ্চ-র আলাপ-আলোচনার রিপোর্ট।
ঘৃতাচু মাইকের সামনে এসে আলাপ-আলোচনার মোটামুটি বিবরণ দিয়ে বললে
—আগামীকাল সকালে আরেক দফা আলোচনা হবে মানপত্রের খসড়াটি শুনিয়ে মানপত্রটিকে পাকা করার।
এইসময় জনতার মধ্যে থেকে রব উঠল
মানপত্রের খসড়াটা আমাদের শোনানো হোক্।

সভাপতি ঘৃতাচুর দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন পড়ে শোনাবার। ঘৃতাচু তার কাঁধের ঝোলা-ব্যাগ থেকে চারভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে পড়তে শুরু করলে—

—শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সুকুমার রায় শ্রীচরণেষু

আপনি বিশ্বকুলতিলক। আপনার প্রতিভায় সূর্যোকরোজ্জ্বল ধরণী আরো অধিকতর আলোকিত। আপনি যথার্থই এক বরেণ্য মণীষী। আপনার গুণ-বর্ণনায় আমরা দীনতাদীনরূপে দরিদ্র।

বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ আপনাকে কেবল শিশু সাহিত্যিক হিসাবে চিহ্নিত করিয়া আপনার ব্যাপ্ত বিশ্ববোধকে নিতান্তই সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা আপনার মৌলিক প্রতিভাকে কিং লিয়ারের আজগুবি ছড়ার সহিত...

সভাপতি মাঝপথে থামিয়ে দিলেন ঘৃতাচুকে।

—কি লিয়ার বললে ?

—আজ্ঞে কিং লিয়ার।

—সে কি ? কিং লিয়ার তো শেক্ষপীর সাহেবের রচনা। ওটা হবে এডওয়ার্ড লিয়ার।

—ইয়েস স্যার। আমারই মতিভ্রম। ক্ষমা করবেন।

—তাতে কি হয়েছে। ওতো মুনিনাঞ্চদেরও হয়। পড়ো।

—একটু আগে থেকে পড়ছি স্যার। তাহারা আপনার মৌলিক প্রতিভাকে এডওয়ার্ড লিয়ারের সহিত তুলনা করিয়া কিরূপে আহ্লাদ-প্লাবিত হয়, তাহা দর্শিয়া আমরা যথাক্রমে বেদনার্ত ও

বিক্ষুব্ধ। পৃথিবীর কাক-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, পশু-প্রাণীর প্রতি আপনার স্নেহ-বিহ্বল করুণা ছলোছলো জননী-সুলভ দৃষ্টিপাত হইতে ইহাই সাতিশয়রূপে সুপ্রমাণিত যে আপনি সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন, যাঁহারা তিমিরান্ধস্য পৃথিবীতে জ্ঞানাঞ্জন শলাকরা সদৃশ । ফরাসী ফেবল রচয়িতা কেল্লাফতের মতো

সভাপতি মহাশয় থামিয়ে দিলেন ঘৃতাচুকে ।

— কি ফতে বললে ?

— আজ্ঞে, কেল্লা ফতে ।

—কেল্লা ফতে কি ফরাসি শব্দ নাকি ? ওটা হবে লা ফঁতেন ।

—তাই হবে । ফরাসিতে আমি স্যার একদম ইললিটারেট । ফরাসি ফেবল্ রচয়িতা লা ফঁতেন-এর মতো আপনিও বণ্য-প্রাণী, কাক-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের সমস্যা-জর্জর সামাজিক জীবনযাত্রাকে সাহিত্যে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে সাহিত্যের অন্যদিকে জীবনের দিগন্তকে মহাপ্রসারিত করিয়া যেভাবে বিশ্বের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাহা মদীয় ভাষায় বর্ণনা করিবার যোগ্য ভাষা আমাদের পক্ষে অজ্ঞাতকুলশীল । আজ এই মহামতি দ্রিঘাংচু-র শতবর্ষ উদ্‌যাপনকালে আমরা আপনার নিকট নতজানুভারাক্রান্ত । কারণ দ্রিঘাংচু-র জীবনদর্শন, তাঁর পরহিতাকাঙ্ক্ষা, এবং তাঁর মহামানবিকতাময় চরিত্রের তুলনারহিত মাধুর্য একমাত্র আপনার রচনার দ্বারাই বিশ্বে প্রচারিত ।

আজ সেই মহাপুরুষের জন্ম শতবর্ষের শুভলগ্নে আপনাকে আমরা সভাপতির পদে বরণ করতে পেরে চিরকৃতার্থ। সমগ্র কাক-পক্ষী জগতের পক্ষ থেকে আপনাকে যৎপরনাস্তি অভিনন্দন।

ইতি মহাপুরুষ দ্রিঘাংচু জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি।

সভাস্থল সাধু সাধু রবে প্রকাশিত। সাধুবাদ থামলে সভাপতির প্রশ্ন

—তা সুকুমার রায় বাবুকে যে সভাপতি নির্বাচন করলে, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে পাকা করে নিয়েছে তো দিনক্ষণ? তিনি কীভাবে আসবেন, কে আনতে যাবে, কখন যাবে?

—আজ্ঞে না, আমরা ভেবেছি যে হরিশ্চ মানপত্রটা সংশোধন করে দিলে মানপত্রসহ-ই তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।

—তিনি কোথায় থাকেন, কখন গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, সে সব খবর নিয়েছ?

—আজ্ঞে না, এখনো নেওয়া হয়নি। তবে সে ব্যাপারে কোনো অসুবিধে হবে না। আমাদের কাকস্যপরিবেদনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক তাঁর বাড়ি চেনেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়েই যাবো আমরা।

—সেটা দ্রুত সমাধা করাই বিধেয়।

তোমাদের আর কোনো এজেন্ডা নেই তো আলোচনার? তাহলে সভাপতির ভাষণ দিয়ে সভা শেষ করে দিই?

ঘৃতাচুদের সম্মতি নিয়ে অদাক্ক আসন ছেড়ে উঠে এলেন

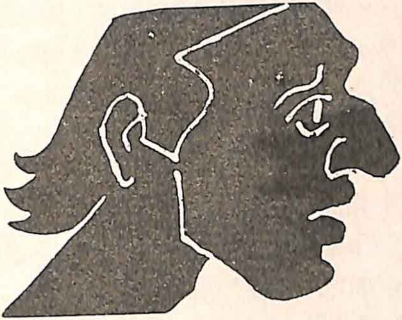
মাইকের সামনে।
—বন্ধুগণ, এখন সভাপতি হিসেবে আমার ভাষণ। তারপরেই সভা শেষ। আমি আপনাদের সামনে কোনো রকম লম্বা-চওড়া ভাষণ দেব না। দেবার সময়ও নেই। গোধূলি সমাগতপ্রায়। আকাশের পশ্চিমপ্রান্ত রক্তচক্ষু শাসকের ন্যায় যদিও এখনও রৌদ্র-বিস্ফারিত, তথাপি, ইতিহাসে যেরূপে একনায়কতন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপে পশ্চিম দিগন্তেরও অচিরাৎ পতন আসন্ন। অপরদিকে পূর্বপ্রান্তের রঙ্গমঞ্চে ইতিমধ্যেই অন্ধকারের যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে। আপনাদিগকে গৃহে ফিরিতে হইবে। সুতরাং সংক্ষিপ্ত ভাষণই বিবেচ্য।

আমি আপনাদের মাত্র একটি বিষয়ে সচেতন হওয়ার অনুরোধ জানিয়েই শেষ করবো আমার বক্তব্য। এক, মহামতি দ্রিঘাংচুর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে আমাদের কাকপক্ষী সমাজে ঘটতে চলেছে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। এই প্রথম আমরা ঐ উৎসবের সভাপতিত্ব পদে বরণ করতে চলেছি এমন একজন বিশ্ববরেণ্য প্রতিভাকে যিনি কাক-পক্ষী সমাজের কেউ নন। শ্রীযুক্ত বাবু সুকুমার রায় মনুষ্য-সমাজের এবং বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী বাঙালী সমাজের একজন। তিনি অশেষ প্রতিভাধর। তাঁহার সম্যক পরিচয় দেওয়া সাধ্যাতীত। তাঁর মতো একজন গুণীজনকে সংবর্ধনা জানানোর ব্যাপারে যদি আমাদের পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, সেটা হবে

সমগ্র কাক-পক্ষী জগতের পক্ষে চিরকালের কলঙ্কজনক।
সুতরাং আপনাদের অনুরোধ জানাবো যাবতীয় মতভেদ ভুলে, কে কোন্ পার্টির তার হিসেব মুলতুবী রেখে, কে কোন্ পন্থী তার বাছ-বিচার না-করে, সকলে একযোগে এক দেহ এক মন হয়ে আসন্ন উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার।
বাবু সুকুমার রায়ের একটি কবিতার দুটি ছত্র উল্লেখ করছি আপনাদের সামনে।

সব লিখেছে, কেবল দেখ পাচ্ছি নাকো লেখা কোথায়—
পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়!

পৃথিবীর যে-কোনো মহৎ কর্মোদ্যমের পিছনেই লেগে থাকে কোনো না কোনো পাগলা-ষাঁড়ের তাড়া। কবি ঠিকই বলিয়াছেন যে, তার প্রতিকার উপায় লেখা থাকে না কোনো বইয়ে। তাহলে লেখা থাকে কোথায়? থাকে আমাদের চৈতন্যের গভীরে। আমাদের মগজের গূঢ় অভ্যন্তরে বিবেক-বুদ্ধির কোষে কোষে। যে-কোনো আকস্মিক পাগলা ষাঁড়ের তাড়ার সঙ্গে মোকাবিলা করে যাতে আসন্ন উৎসবটিকে চূড়ান্ত সাফল্যমণ্ডিত করা যায়, তার শপথ নিতে হবে আজ আমাদের প্রত্যেককে। জয় হিন্দ্।



৩

১৩ জানুয়ারি। বৃহস্পতিবার। কাক-পক্ষীর জগতে পাবলিক হলিডে। ধর্মগুরু কাকুক্ষানন্দের জন্মদিবস। আগের দিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল যে সময়ে, ঘড়ি ধরে ঠিক সেই সময়েই ঘৃতাচু হাজির লুব্ধতাভ-র বাড়িতে। লুব্ধতাভই কাকস্যপরিবেদনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক। তদুপরি ডক্টরেট। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, বিশ্বসাহিত্যে কাক-সমাজের অবদান।

ঘৃতাচু দরজার কড়া নাড়তেই খিল খুলে মুখ বাড়াল লুব্ধতাভ-র মেজ মেয়ে মিন্দা।

—ওঃ, আপনি এসে গেছেন ? ভিতরে আসুন।

ঘৃতাচু লুব্ধতাভ-র স্টাডিরুমে গিয়ে বসলে লুব্ধতাভ-র স্ত্রী দ্রাঘিমা এসে বললে

—একটা জরুরী কাজে উনি বেরিয়ে গেছেন। ওঁর খেয়াল

ছিল না যে আজই ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে সেমিনার রয়েছে ওঁর। তবে উনি আমার বড় ছেলে কৃচঞ্চুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। ওঁর বদলে সেই আপনাকে নিয়ে যাবে সুকুমারবাবুর কাছে। আপনি একটু বসুন। কৃচু তৈরী হচ্ছে। আপনি চা খাবেন তো ? আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চা খাওয়ার পরই কৃচঞ্চু-র সঙ্গে বেড়িয়ে পড়ে ঘৃতাচু। যেতে যেতে কথা হয় দুজনের।

—তুমি কি আগে কখনো গেছ সুকুমারবাবুর বাড়ি ?

— আজ্ঞে না, আগে কখনো যাইনি। তবে বাবা আমাকে ম্যাপ এঁকে সব বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন।

—কতদূর যেতে হবে আমাদের ?

—বেশিদূর নয়। খালাসীটোলার পাহাড় ডিঙোলেই লবঙ্গী নদী। নদীর ওপারে রেললাইন। ঐ রেললাইন ধরে মাইল তিনেক গেলেই নতুন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাউন। ঐ টাউনের পিছনে পুরনো টাউন কাককাকলিপুর। সেই পুরনো টাউনের অক্রুর দত্ত লেনে যেতে হবে আমাদের। ওঃ হো। আমি একটা মস্ত ভুল করেছি।

—কি ভুল ?

—বাবা আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, সেটা পকেটে রয়েছে, অথচ আপনাকে দিতে ভুলে গেছি।

কৃচঞ্চু চিঠিটা এগিয়ে দেয় ঘৃতাচু-র দিকে। ঘৃতাচু চিঠিখানা খুলে পড়ে।

—কল্যাণীয় ঘৃতাচু,
অনিবার্যকারণবশত আজ আমি তোমার সঙ্গে বাবু সুকুমার রায়ের ওখানে যেতে পারলুম না। ব্যক্তিগতভাবে সুকুমারবাবুর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা আমার মধ্যেও প্রবল ছিল। আমি বাল্যকাল থেকেই তাঁর রচনার একজন মুগ্ধ পাঠক। যাই হোক, আমার পুত্র শ্রীমান কৃচঞ্চু আমার পরিবর্তে তোমাকে সুকুমার বাবুর কাছে নিয়ে যাবে। তবে সুকুমারবাবুর ঠিকানা আমার যে ডায়েরিতে লেখা ছিল তা এই সময়ে হাতের কাছে না পাওয়ায় যেটুকু রিমেমবার করতে পারলুম, তাই-ই জানিয়ে দিলুম। তোমাদের জন্মশতবার্ষিক স্যুভেনিরের জন্যে যে প্রবন্ধ লিখতে বলেছ, তা যথাসময়ে পাবে।
প্রীতিসহ
তোমাদের
ডঃ লুব্ধতাভ
চিঠিখানা পড়ে ঘৃতাচুর মুখ শুকিয়ে যায়। সে কৃচঞ্চুকে প্রশ্ন করে
—আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারবো তো ?
—আপনি ও নিয়ে চিন্তা করবেন না কাকু। অক্রুর দত্ত লেন খুব কালচারাল জায়গা। একবার গিয়ে পড়লে ঠিক ঠিকানা কেউ না কেউ বলে দেবে।
রোদে পুড়ে ঘেমে নেয়ে ওরা যখন অক্রুর দত্ত লেনে পৌঁছলো তখন দশটা বেজে গেছে। ফলে অক্রুর দত্ত লেনের সমস্ত

মানুষই অফিসমুখো। ওরা দুজনে একটা ল্যাম্পপোষ্টের উপরে বসে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতেই দেখতে পেয়ে যায় গলির মাঝামাঝি রোয়াকে একজন লুঙি আর ফতুয়া-পরা ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ে চলেছেন একমনে, ছোলাভাজা দিয়ে একবাটি মুড়ি খেতে খেতে। ঘৃতাচুরা বুঝে গেল, ভদ্রলোক রিটায়ার্ড। পেনসনে আছেন। সাহস করে ল্যাম্পপোষ্ট থেকে এক লাফে একটা একতলা বাড়ির কার্নিশে। সেখান থেকে এবাড়ি-ওবাড়ি ডিঙিয়ে একদমে ফুটপাতে নেমে ভদ্রলোকের সামনে।

—স্যার…

—চাঁদা যা দেওয়ার দিয়ে দিয়েছি। আর হবে না।

—আমরা চাঁদা চাইতে আসি নি—স্যার। একটা ঠিকানা

—ঠিকানা দেওয়ালে লেখা আছে।

—এ ঠিকানা নয় স্যার।

—তবে কি আপিসের ? আমাদের আপিসে এখন লক্‌আউট।

—আজ্ঞে না স্যার। আমরা সুকুমারবাবুর…

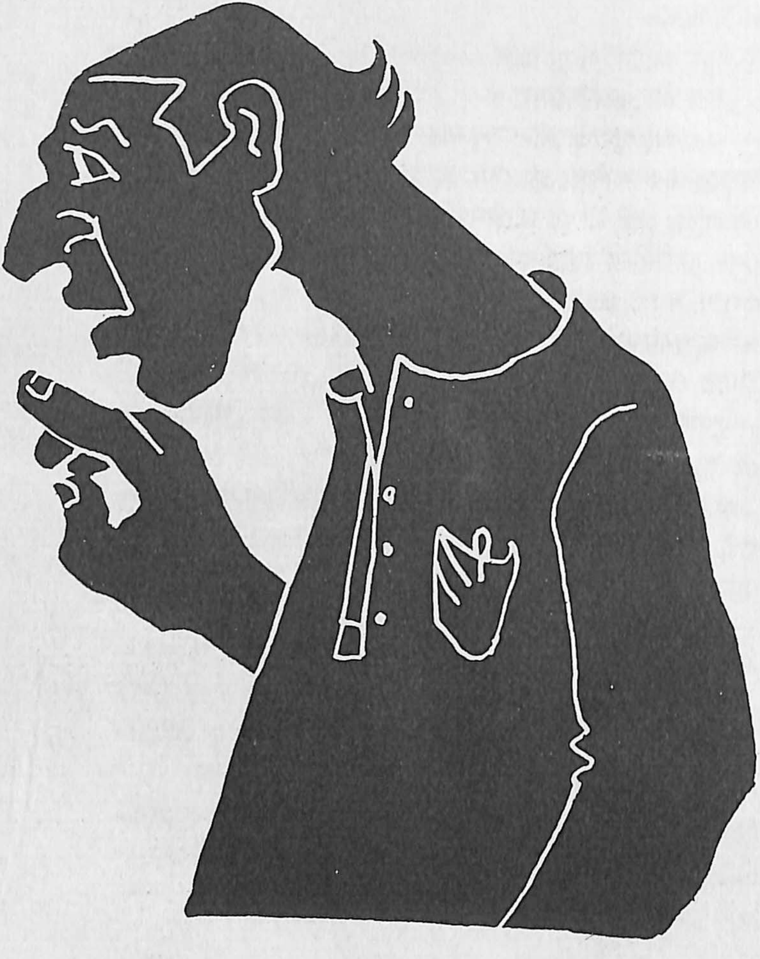
ভদ্রলোকের হঠাৎ খেয়াল হয় যে-কণ্ঠস্বর তিনি শুনছেন, তা মানুষের নয়। তাই খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ঘৃতাচুদের দিকে তাকান।

—কি ব্যাপার ? কাকে চান আপনারা ?

—আজ্ঞে, সুকুমারবাবু…

সুকুমার বাবু তো এ অঞ্চলে তিনজন। ঠিক কোন্ সুকুমার বাবু

না বললে—
ঘৃতাচুর আগে কৃচঞ্চু বলে
—যাঁর আবোলতাবোল...
—ওঃ, আবোলতাবোল সুকুমার ? সোজা চলে যান, বাঁহাতে পড়বে একটা নাপ্‌তের দোকান, মানে সেলুন। তার পাশ দিয়ে যে গলি, সেই গলির মাঝামাঝি গেলে দেখতে পাবেন একটা লেদ মেসিনের ছোট্ট কারখানা। তারই ডানদিকের বাড়িটা। হলদে-সবুজ ওরাং-ওটাং ধরনের রঙ।
—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।
যেতে যেতে কৃচঞ্চু বলে
—দেখলেন কাকু, আপনি ভয় পাচ্ছিলেন। ঠিক পেয়ে গেলাম।
ওরা দুজন হল্‌দে-সবুজ ওরাং-ওটাং রঙের বাড়ির দরজায় পৌঁছে কলিংবেল টেপে।
বাড়ির চাকর দরজা খুলে জিজ্ঞেস করে
—কাকে চাই ?
—সুকুমারবাবু আছেন ?
—আছেন।
—আমরা একটু দেখা করবো।
—ভিতরে এসে বসুন।
চাকর ওদের একটা আধময়লা ড্রয়িংরুমে বসতে দেয়। মিনিট তিনেক পরে ঘরে ঢোকেন সুকুমার বাবু। ওরা দুজন উঠে



দাঁড়িয়ে নমস্কার করে ।

—বলুন, কি ব্যাপার ?

—আজ্ঞে, আমরা আপনাকে সভাপতি হিসেবে পেতে চাই মহামতি দ্রিঘাংচুর জন্মশতবার্ষিক উৎসবে ।

—সভাপতি ? সভাপতি হওয়া তো আমি লাস্ট ইয়ার থেকে ছেড়ে দিয়েছি । কেন ছেড়ে দিয়েছি সেটা আপনাদেরও শুনে রাখা দরকার । আপনারা সভা করেন । সভায় যিনি আধঘণ্টা গান করেন, তাকে দেন তিন হাজার টাকা । তবলচি পায় পাঁচশো টাকা । অথচ সভাপতি হয়ে আমি যে একঘণ্টা গলদঘর্ম জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করলাম, তার বেলায় লবডঙ্কাটি । হাতে ট্যাক্সীভাড়ার পঁচিশ টাকা গুঁজে দিয়ে কর্মকর্তারা উধাও । ব্যাপারটা এইখানেই শেষ নয় । যে লোকটা গান গাইছে, তার তো গানগুলো মুখস্থ । দশটা হোক বিশটা হোক, মুখস্থ গানই সে গেয়ে চলেছে আজ এ-সভায়, কাল সে-সভায় । কিন্তু সভাপতিদের কি সভার ভাষণ মুখস্থ থাকে ? আজ বলতে হবে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে । কাল বলতে হবে ভারতের জাতীয় সংহতি নিয়ে । পরশু ইকোলজি বিষয়ে । এর জন্যে তো প্রিপারেশন চাই । হোম ওয়ার্ক চাই । ধ্যান চাই । বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা ? কিন্তু এত সব মেহনতের পরিণামটা কি শেষ পর্যন্ত ? বক্তৃতার মাঝখানে শুনতে হবে শ্রোতাদের চিৎকার । আপনি বসে পড়ুন । আমরা গান শুনবো । এই তো দেশের অবস্থা । এই হাড়ে-মাসে করাপটেড দেশে আর আমার

সভাপতি হওয়ার একবিন্দু ইচ্ছে নেই । এর চেয়ে কাক-পক্ষী পশু-প্রাণীর জগত অনেক সিভিলাইজড্ । কাক-পক্ষীরা সভাপতি হতে ডাকে যদি, তাতে বরং রাজী । কিন্তু মানুষের সভা-সমিতিকে নেই্ আর ।
ঘৃতাচু বুকে বল পায় এতক্ষণে ।
—স্যার, আমরা কাক-পক্ষীর জগত থেকেই আপনাকে সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি ।
—ওঃ, তাই নাকি । তাহলে এগ্রিড । কবে অনুষ্ঠান ? উপলক্ষ্যটা কি ?
—অনুষ্ঠানের দিনটা এখনো স্থির হয়নি । আপনার ডেট অনুযায়ী হবে । উপলক্ষ্য হলো, মহামতি দ্রিঘাংচু-র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন । দ্রিঘাংচু সম্পর্কে আপনাকে আর বিশেষ কি বলার আছে । আপনি তো স্যার তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত করেছেন ।
—আমি ? কাকে বিশ্ববিখ্যাত করেছি বললেন ?
—আজ্ঞে, মহামতি দ্রিঘাংচু ?
—কে তিনি ?
—আজ্ঞে, দাঁড়কাক বংশের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ ।
—আপনাদের ডায়ালগ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না । মহামতি বলতে আমি শুধু একজনেরই নাম জানি । তিনি গোখলে । আর তো কাউকে জানিও না, নামও শুনেনি কখনো ।
—আপনি ভুলে যাচ্ছেন স্যার । আপনার 'দেশ বিদেশের গল্পের' ষোল নম্বর রচনার নাম 'দ্রিঘাংচু' ।

—আমার গল্প ? কস্মিনকালেও আমি কখনো কোনো বই লিখিনি। এমনকি কবিতাও, যা বাঙালীমাত্রেই লিখে থাকে। তোমরা ভুল ঠিকানায় এসেছ। কে তোমাদের আমার ঠিকানা বলে দিয়েছে বলতো ?

—আজ্ঞে, মোটাসোটা ভুঁড়িওয়ালা একজন ভদ্রলোক রোয়াকে বসে মুড়ি ছোলাভাজা চিবোতে চিবোতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, তিনিই।

—ওঃ বুঝেছি, জয়কেষ্ট। হারামজাদা। আমার নাম্বার ওয়ান এনিমি। আমি নাকি সভাপতি হিসেবে আবোলতাবোল বকি, তাই আমার নাম দিয়েছে আবোলতাবোল সুকুমার।

ঘৃতাচুর মাথায় বাজ পড়ল যেন। বজ্রাহত ঘৃতাচু করুণ স্বরে প্রশ্ন করলে

—আপনি স্যার সুকুমার রায় নন ?

—কেন হতে যাবো মোশায় ? পাঁচ পুরুষ আগে ছিলাম দত্ত মজুমদার। এখন শুধু মজুমদার। রায় গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের জল চলে না।

—তাহলে স্যার উঠি আমরা।

বাইরে এসে ঘৃতাচু কপালের ঘাম মোছে রুমালে। কৃচঞ্চুর দিকে হতাশ চোখে তাকায়।

—কি করা যায় বলতো ?

—আপনি ঘাবড়াবেন না কাকু। খুঁজে আমি বের করবোই, বেরিয়েছি যখন। অনেক বেলা হয়েছে। চলুন একটু কিছু মুখে

দিয়ে নি ।
খুঁজতে খুঁজতে একটা দোকান মিলে গেল । নাম, উচ্ছিষ্ট ।
সেখানেই হঠাৎ দেখা গণ্ডোলাস-এর সঙ্গে । গণ্ডেলাস ঝাউগিরি বনের যে বাড়ির জামাই, সম্পর্কে ঘৃতাচু তাই গণ্ডোলাসের মামা শ্বশুর । তারা ঘৃতাচু-র নিকট আত্মীয় । ঘৃতাচুকে দেখে গন্ডোলাস প্রণাম করে বললে
—মামাবাবু, আপনি এখানে ?
ঘৃতাচু সমস্ত বিবরণ শোনালে তাকে । গণ্ডোলাস বললে
—চলুন তো আমার সঙ্গে । এখানে একজন ডক্টরেটকে আমি চিনি । গত দশ বছর ধরে রিসার্চ করছেন শালগ্রামশিলা গোল কেন, তাই নিয়ে । জার্মানীর লখস্টভ ইনস্টিটিউট এখন অনুবাদ করছে সে বইয়ের । আমার মনে হয় ওঁর কাছে গেলে হদিশ মিলবে ।
ওরা তিনজন ডক্টর ব্যানার্জীর ড্রইংরুমে । কৃচঞ্চু রাস্তায় সাবধান করে দিয়েছে ঘৃতাচুকে, আপনি আর 'আবোলতাবোল'-এর কথা পাড়বেন না । অন্য বই-এর নাম বলবেন । 'আবোল তাবোল' শুনলে হয়তো আবার ঐ সুকুমার মজুমদারের ঠিকানায় চালান করে দেবে ।
ডক্টর ধর সৌম্য, শান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত এবং বয়স্ক । দেখলেই বোঝা যায় বৈজ্ঞানিক । যেদিকে তাকান, সেদিকে তাকান না । তাকান তার আরো ভিতরে । যেমন আমের দিকে তাকালে সাধারণ মানুষ দেখতে পায় আমের বাইরের ছাল-খোলস । ইনি

দেখতে পান ভিতরের আঁঠি, রস নিংড়োনো। ডক্টর ধর ঘরে ঢুকলেই ওরা তিনজনে প্রণাম করতে উদ্যত হয়। তিনি প্রণাম না নিয়ে নিজের সোফায় বসেন মুখে পাইপ লাগিয়ে।
ঘৃতাচু সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলে। ঘৃতাচুর কথা শেষ হলে গাওলাস জুড়ে দেয়—খুবই গণ্ডগোল-এ পড়েছেন এঁরা।
ডক্টর ধর নেভা পাইপে আগুন ধরান।
—দেখুন, আপনারা খুঁজছেন একজন শিশু সাহিত্যিককে। ব্যাপারটা যখন শিশুকেন্দ্রিক, তখন আপনারা কোনো গায়নোকলজিস্ট-এর কাছে না গিয়ে আমার মতো সায়েনটিস্ট-এর কাছে এলেন কেন, এটা আমার কাছে একটা মিসট্রি। আমার গবেষণার বিষয়, গোল। গণ্ডগোল নয়। শালগ্রামশিলার গোলত্বের ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়েই আমার প্রথম দফার কাজটা শেষ করে আমি এখন যা নিয়ে রিসার্চ করছি সেটা হল, হাফ-রাউন্ড। বিষয়টাকে সংক্ষেপে বোঝাতে গেলে বলতে হয়, দা কনট্রিবিউশন অফ হাফ রাউন্ড ইন বিল্ডিং আপ দা রেনেশাঁস-কনসেপশন ইন দা মিডিয়াভ্যাল ইটালি। আমি কখনো শিশু সাহিত্য পড়িনি। তবে আপনাদের কথা শুনতে শুনতে এখন যেন রিমেমবার করতে পারছি সুকুমার রায় নামটা শুনেছি একবার। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ইংলন্ডের অ্যাটমিক এনার্জি ইনস্টিটিউটের ডক্টর লিনলিথ হোয়াইটহেড তাঁর চিঠিতে সুকুমার রায় নামে একজন বাঙালি যুবকের মণীষার খুব প্রশংসা করেছিলেন। আচ্ছা,



আপনাদের সুকুমার রায় কি কখনো বিলেতে ছিলেন ?
—আজ্ঞে হ্যাঁ, শিখতে গিয়েছিলেন প্রিন্টিং টেকনোলজি ?
—প্রিন্টিং টেকনোলজির লোক হলে সায়েনটিস্ট হোয়াইটহেড তাঁর প্রশংসা করবেন কেন ?
—আজ্ঞে, উনি সায়েন্সেরই লোক। রসায়ন আর পদার্থ বিদ্যায় বি· এস· সি পাশ করেছেন ডাবল অনার্স নিয়ে।
—এই বলছেন শিশু সাহিত্যিক। তাহলে আবার বৈজ্ঞানিক হন কি করে ?
—সে আপনি ওঁনার রচনাবলী পাঠ করলেই বুঝবেন। শুধু সায়েনটিস্ট নয় স্যার, উনি আবিষ্কার করেছেন অনেক কিছু।
—যেমন ?
—আইনস্টাইন রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন অন্যমনস্কভাবে। দুটি ছোকরা লোভ সামলাতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসল, old man, does two and two make four? আইনস্টাইন উত্তর দিলেন Yes' if they are not in motion. বাংলা সাহিত্যে আইনস্টাইন এই মোশান-তত্ত্বকে সুকুমার বাবুই প্রমাণ করে দেখালেন প্রথম। যে-সব পশুপ্রাণীরা মোশানে থাকে মানে দৌড়-ঝাঁপ করে তাদের পরস্পরের যোগফলে জন্ম নেয় তৃতীয় এক প্রাণী। যেমন স্যার হাঁস যুক্ত সজারু ইজিকালটু হাঁসজারু। তেমনি বক + কচ্ছপ, বকচ্ছপ। এরকম অঢেল উদাহরণ আছে স্যার। ওনার ট্যাস-গরু কিংবা কিম্ভুত জাতীয় কবিতাগুলো পড়লে আপনি

—তার মানে ?
—কারো নামের আগে যদি চন্দ্রবিন্দু থাকে বুঝতে হবে তিনি ভবলীলা শেষ করে স্বর্গীয় ।
—তাইতো, তাইতো ! আপনাদের সঙ্গে কথা বলে এখন বুঝতে পারছি সুকুমার বাবু সত্যিই একজন জিনিয়াস । এ রকম মানুষের সঙ্গে আমারও আলাপ হওয়া দরকার । দরকার ওঁর লেখা বইগুলো পড়ে ফেলা । কত বই লিখেছেন উনি ?
—অনেক স্যার । যেমন ধরুন আবোল
পিছন থেকে ঘৃতাচুকে চিমটি কাটে কুচঞ্চু । ঘৃতাচু বুঝলে এখুনি মুখ ফস্‌কে বারণ-করা নামটাই বলে ফেলতে যাচ্ছিল সে । নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—
—ঝালাপালা, পাগলা দাশু...
—কি বললেন ? পাগলা দাশু-উ ? পাগলা দাশু তো থাকে আমাদের এই অঞ্চলেই এবং তাকে নিয়ে যথেষ্ট ঝালাপালা সবাই ।
তাই নাকি ?
—হ্যাঁ । আমাদের এই কলোনীর সেক্টর থ্রি-তে । এটা ওয়ান । এর পরের পরেরটায় ।
—যদি ঠিকানাটা দিতেন স্যার...
—ঠিকানা আমি জানি না । তবে সেক্টর থ্রি-তে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে যে কেউ বলে দেবে ।
ডক্টর ধরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরে এলে গণ্ডোলাস বলে

বুঝতে পারবেন সাহিত্যের ব্যাকরণ না মেনে বিজ্ঞানের ব্যাকরণ মেনেছেন উনি।

ডক্টর ধর আবার লাইটার জ্বালান নিভে যাওয়া পাইপ ধরাতে।

—খুবই ইনটারেস্টিং লাগছে আপনাদের কথাবার্তা।

—আরও শুনবেন স্যার ?

—বলুন, বলুন।

—উনি দেখালেন, রুমাল, বেড়াল এবং চন্দ্রবিন্দু পারস্পরিক বৈপরীত্য স্বত্ত্বেও মূলত এক।

—হোয়াট ননসেন্স য়ু আর টকিং ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, ননসেন্সের আড়ালেই উনি লুকিয়ে রাখতে ভালোবাসেন ওঁর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ। আইনস্টাইন-এর থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি কিংবা হাইজেনবার্গের প্রিন্সিপ্যাল অফ ইনডিটারমিনেসি মানলে এটা তো বুঝতে তো স্যার একটুও অসুবিধের কথা নয় যে বস্তুর মতো শক্তিও ভর-নির্ভর। সুতরাং বস্তু ও শক্তি অর্থাৎ M আর E একই মায়ের পেটের যমজ ভাই। সুতরাং রুমালের পক্ষে বেড়াল এবং পরিশেষে বেড়ালের পক্ষে চন্দ্রবিন্দু হওয়াটা পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত।

—চন্দ্রবিন্দু-র প্রসঙ্গটা তুলে খুবই উপকার করলেন আমার। চন্দ্রবিন্দুটাও যে একটা হাফ-রাউন্ড, এটা মনে পড়েনি কখনো। খুবই কাজে লাগবে আমার।

—চন্দ্রবিন্দু আবার এক অর্থে স্যার হেভেনলি সাইন।

—মামাবাবু, এতদিন বাদে এদিকে এসে গেছেন যখন, চলুন না আজ আমাদের বাড়িতেই খেয়ে নেবেন দুমুঠো।

ঘৃতাচু রাজী হয় না।

— সে পরে একদিন এসে খেয়ে যাবো কলেজের ছুটি-ছাটার দিনে। আজ খাওয়ার মতো ইচ্ছেও নেই তেমন।

গণ্ডোলাসের কাজ আছে বলে সে সেখান থেকে বিদায় নেয়। ঘৃতাচু ও কৃচঞ্চু ডানা মেলে সেক্টর থ্রি-র দিকে। ঘৃতাচুর চোখে মুখে তখনো বেশ উদ্বেগ। সত্যিই সুকুমার রায়কে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে তার যেন খানিকটা সন্দেহ। কুচঞ্চু সে তুলনায় অনেক টগবগে এখন।

—পাগলা দাশুর দেখা পেলেই মনে হচ্ছে মুস্কিল আসান হয়ে যাবে কাকু।

—না আঁচালে আমার আর বিশ্বাস নেই ।

ঘৃতাচুর উচ্চারণে দীর্ঘশ্বাস।

সেক্টর থ্রি-র দিকে উড়ে যেতে যেতে ওরা দেখতে পেল একটা জায়গায় লোকে লোকারণ্য।

কৃচঞ্চু ঘৃতাচুকে

—কাকু, মনে হচ্ছে কিছু ঘটেছে একটা জবর।

নেবেন নাকি খবর ?

ঘৃতাচু কৃচঞ্চুকে

—হ্যাঁ, বেশ গোলমালের গন্ধ পাচ্ছি নাকে,

নেমেই দেখা যাক কে পড়ল কি বিপাকে।

গোলমাল-অঞ্চলের কাছাকাছি একটা জামরুল গাছের ডালে বসতে গিয়ে দেখল ওদের আগেই অনেক কাক-পক্ষীর ভিড় জমে গেছে সেখানে। নিজেদের জাত-গোত্রের লোকজনকে পেয়ে গিয়ে আলাপ জমিয়ে নেয় ওরা তৎক্ষণাৎ।

—কি ঘটেছে দাদা এখানে ? আছে নাকি জানা ?

—ঐ পাগলা দাশুকে নিয়ে কাণ্ড-কারখানা।

—পাগলা দাশু ?

ঘৃতাচু ও কৃচঞ্চু পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

—কি কাণ্ড-কারখানা বলবেন একটু ?

—আমি এসেছি খানিক আগে। সবটা জানি না।

পাশ থেকে এক বাজপাখি বললে

—পাগলা দাশুকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। চিৎকারটা তারই। কাল রাত্তির থেকে পাগলামি হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে। আজ সকালে কাটারি নিয়ে যাকে সামনে পাচ্ছে তারই পিছনে তাড়া করছিল কাটবে বলে। অনেক কষ্টে কাটারিটা কেড়ে নেওয়া গেছে হাত থেকে। তারপরই ঐ হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রাখার ব্যবস্থা।

—তাহলে সুকুমারবাবুর লেখা-জোখার খুব বিঘ্ন হবে ?

প্রশ্নটা করে ঘৃতাচু। বাজপাখির উত্তর

—সুকুমারবাবু কি এখানে আছেন নাকি যে বিঘ্ন হবে তার ?

—নেই ?

—না। তিনি তো বছরের বেশির ভাগ সময়ই থাকেন



রূপনারায়ণের কাছে কোলাঘাটে। সেখানেই বিরাট কাঠের ব্যবসা।

—কাঠের ব্যবসা ? তার মানে উনি লেখক নন ?

—লেখক ?

বাজপাখিটা খি খিচি খিখিচি সুরে হেসে নেয়।

—বক্রেশ্বর রায়-এর বেটা সুকুমার রায় আবার লেখক হল কবে ? আপনি কোন্ দেশের লোক মশাই ?

আপনি তো দেখছি কিছুই খবর রাখেন না এখানকার। এই রায় বংশের চোদ্দপুরুষে কেউ কখনো পাঠশালা মাড়ায় নি।

ঘৃতাচু কৃচঞ্চুর দিকে ঘুরে তাকায়। তার মুখে যেন দুঃস্বপ্নের কালি লেপে দিয়েছে কেউ। কৃচঞ্চুও মুষড়ে পড়েছে কিছুটা। তাদের কথোপকথন।

—শুনলে তো সব ! আমরা যে সুকুমারবাবুকে খুঁজছি, ইনি তো তিনি নন। হলে না হয় কোলাঘাটের কাঠগুদামে গিয়ে হাজির হতাম।

কৃচঞ্চু মচকালেও, ভাঙতে চায় না। তখনো বিশ্বাসে অবিচল থাকতে চায় সে।

—এটা কি রকম ব্যাপার ঘটছে জানেন কাকু। এক-একটা চেনা নাম জানা নাম, বলতে গিয়ে হঠাৎ ফরগেট। জিভে আসে তো ঠোঁটে আসে না।

আমি যেন দেখতে পাচ্ছি সুকুমারবাবুকে, অথচ দেখতে পাচ্ছি না। এই মনে হচ্ছে পেয়ে গেলাম, পেয়ে গেলাম, অথচ পাচ্ছি

না।

—ক্রাইসিসটা বেশ জোরালো হয়ে উঠছে ক্রমশ। এত পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত যদি সুকুমারবাবুকে খুঁজে না পাই তাহলে গোটা উৎসবটাই তো মাঠে মারা যাবে।

ওদের কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ বাজপাখীর প্রশ্ন

—কিছু মনে না করলে আপনাদের একটা কোশ্চেন করতে পারি কি ?

—নিশ্চয়। উইদাউট হেজিটেনশন।

—আপনারা কাকে খুঁজছেন বলুন তো ?

—সুকুমারবাবুকে। মানে বাংলা শিশু সাহিত্যের অদ্বিতীয় লেখক সুকুমার রায়কে।

—তাহলে তো মিলে গেল দেখছি।

—কি মিলে গেল ?

—আরো একজন লোকও ঐ সুকুমার রায়কেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—কে বলুন তো ?

—বাবুরাম সাপুড়ে। আমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে পরশু। তখনো আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বলেছে, তিক্ষ্ণাসাবাবু, আপনি তো দশ জায়গায় ঘুরে বেড়ান, লেখক সুকুমারবাবুর খোঁজ পেলে আমাকে একটু জানাবেন তো দয়া করে। তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমার ভীষণ দরকার।

—আপনি বাবুরাম সাপুড়ের বাড়ি চেনেন ?

—তা চিনবো না কেন ?

—আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো, আমরাও একটা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাবো আপনাকে ।

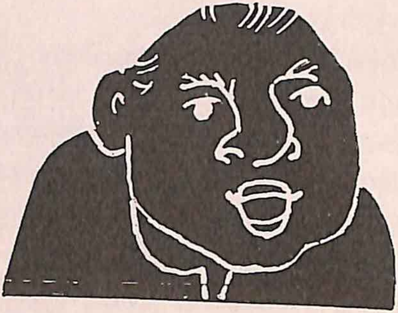
—আরে মশাই, এক বিনয় করে বলার কি আছে ? আপনারা বিদেশী পথিক । আপনাদের কোনো উপকারে লাগতে পারলে, আমিই তো ওবলাইজড মনে করবো নিজেকে ।

—আমাদের একটু ঠিকানা বলে দেবেন বাবুরাম সাপুড়ের ?

—ঠিকানা বলার কি দরকার ! আমি তো ঐ পথ দিয়েই বাড়ি ফিরবো । আপনারা বরং চলুন না আমার সঙ্গে, যদি কোনো অসুবিধে না থাকে ।

—না, না, কোনো অসুবিধেই নেই আমাদের ।





৪

স্থান, বাবুরাম সাপুড়ের বিশাল অট্টালিকার অন্তর্গত ড্রইংরুম ।
কাল, দ্বিপ্রহর । পাত্র পাত্রী, বাবুরাম, ঘৃতাচু ও কৃচঞ্চু ।

বাবুরাম । আপনাদের সঙ্গে হয়ে পরিচিত
আমি যৎপরনাস্তি আহ্লাদিত ।
ইহা হয় এক আশ্চর্য কাণ্ড
আপনারাও ঘুরছেন ব্রহ্মাণ্ড
যাকে বলে হয়ে হন্যে
এমন একজন মহাপুরুষের জন্যে
যাঁকে আমারও দরকার খুব আরজেন্ট ।
জানেন তো বয়স বাড়লে স্মৃতি ক্রমশ ফেট ।
ঘটনা মুছে গিয়ে লেগে থাকে কিছু ছোপ্ ছাপ্
এই যেমন ধরুন না
সুকুমারবাবুর সঙ্গে যে ঠিক কোন্ বছরে

আলাপ-সালাপ
ভুলে গেছি বেবাক ।
অথচ স্পষ্ট শুনতে পাই এখনো তাঁর সেই মিঠে
গলার ডাক
বাবা বাবুরাম
তোমার সাপ-খেলানো বাঁশীর সুরে পাই কী যে
আরাম
কি করে বোঝাই, ভাষা ফেলিওর ।
তখন থেকেই ডেলি ওঁর
দেখা না পেলে মনটা হয়ে যেতো মাটি ।
একদিন ওঁদের বাড়ির সামনে হাঁটছি, রোজ যেমন
হাঁটি
হঠাৎ শুনি দোতলা থেকে সুকুমারবাবুর সাড়া
—বাবুরাম, একটু দাঁড়া ।
এক দৌড়ে আমার কাছে, এসে বললেন, আজ
লাঞ্চের টাইমে
লিখেছি একটা পদ্য ননসেন্স রাইমে
তোকে নিয়ে, নাম বাবুরাম সাপুড়ে
ভাবছি আমার আবোল-তাবোল-এর সঙ্গে দেব
জুড়ে ।
কবেকার এসব বৃত্তান্ত
মনে হয় যেন এই সিদিনের, এমনি জ্যান্ত ।



তখন ছিলাম যাকে বলে অতিশয় দীন-দরিদ্র
ঘরের চাল, পরনের কাপড় শতছিদ্র

ঘৃতাচু । বলেন কি ? বিশ্বাস করবে কে বা কারা ?

বাবুরাম । ছিলাম পুরোপুরি সর্বহারা
মানে প্রোলেটারিয়েট
বৌ ছেলের কাছে পর্যন্ত মাথা হেঁট ।

ঘৃতাচু । কি করে খুলল সৌভাগ্যের সোনার গেট ?
কি করে বানালেন এমন অমরাবতী-মার্কা বাড়ি ?
গ্যারেজেও তো দেখছি গোটা তিনেক গাড়ি ।
যা রেস্ত জানিয়েছেন, বলব না মিথ্যে
ইলেকসানে দাঁড়ালে পারতেন এম· পি হয়ে
জিত্‌তে ।
আপনার ঐশ্বর্যসম্ভার দেখে মনে পড়ছে ছেলেবেলার
শ্লোক
"রফ্‌ফেলার ও ফোর্ড হবার জাগছে বেজায়
ঝোঁক" ।
কি করে বানালেন নিজেকে এমন কোটিপতি
শুনতে ইচ্ছে করছে, অবশ্য যদি ঘটে তেমন ক্ষতি
দরকার নেই, বলবেন না ।
(চাকরের প্রবেশ । তিনকাপ চা ও খাবার প্লেট রেখে
প্রস্থান ।

বাবুরাম । আসুন, আয়োজন সামান্য । একটু চা ।

ঘৃতাচু । কি বলছেন ? প্লেটে তো মণ্ডামিঠাই ভর্তি ।
বাবুরাম । এমন কিছু নয়, এক রত্তি । (বাবুরামের প্রস্থান)
কৃচঞ্চু । ওদিকে দেখুন মর্তমান কলার বাঞ্চটা ।
ঘৃতাচু । একদিক থেকে ভালোই, সেরে নেওয়া যাবে লাঞ্চটা ।
কৃচঞ্চু । কিন্তু কাকু, ভদ্রলোকের বড়লোক হওয়াটা বেশ মিস্ট্রি ।
ঘৃতাচু । হ্যাঁ, জানতেই হবে তার হিসট্রি ।
বাবুরামের প্রবেশ । হাতে ফটোগ্রাফের অ্যালবাম ।
বাবুরাম—এই নিন, খেতে খেতেই চোখ বুলোন ছবিগুলোর
তাইলেই বুঝবেন, যে ছিল রাস্তার ধুলোয়
সে কি করে নিজেকে বানাল, মাই ডিয়ার,
অলমোস্ট, এ মিলিওনিয়ার ।
(ঘৃতাচু ও কৃচঞ্চু খেতে খেতে অ্যালবামের ছবি দেখতে থাকে ।)
কৃচঞ্চু । এতো দেখছি সাউথ ইন্ডিয়ান সিনেমার স্টিল ।
ঘৃতাচু । তাইতো । আপনি সিনেমা বানান নাকি ?
বাবুরাম । আমি আর কবে সিনেমা বানালাম । সিনেমাই আমাকে আজ এই রকম কোটিপতি বানিয়ে দিয়েছে ।
ঘৃতাচু । কি রকম ? কি রকম ?
বাবুরাম । আসলে আমার ভাগ্য পরিবর্তনের মূলের আদিতে

বাবু সুকুমার রায় ।
পরবর্তী পর্বে এই সিনেমা । বাবু সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল বইয়ে আমার নামে লেখা কবিতা পড়ে সাউথ ইন্ডিয়ার সিনেমা পাড়া থেকে ডাক আসে, সাপ সাপ্লায়ের । আপনারা হয়তো দেখেন নি সে সব ছবি । মাঝখানে সাউথ ইন্ডিয়ার ছবিতে নায়িকারা হঠাৎ হঠাৎ সাপ হয়ে যেত । কখনো কখনো নায়কও । দিনের পর দিন সাপ নিয়েই শুটিং । পশ্চিমবাংলার কাল-কেউটে বিখ্যাত । আমি শুধু সাপ সাপ্লাই-ই দিতাম না । ছিলাম তাদের ট্রেনারও । পরিচালক যা বলেন, সাপকে দিয়ে আমি তাইই অভিনয় করাই । ফলে দু-দফা রোজগার । এবার বুঝলেন, হাউ আই বিকেম এ মিলিওনিয়ার মালটি ?

ঘৃতাচু । বিলক্ষণ ! বিলক্ষণ ।

বাবুরাম । বাবু সুকুমার রায়ের অনুগ্রহেই আমার এই প্রতিপত্তি । তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যেই খুঁজে বেড়াচ্ছি ।

ঘৃতাচু । খুঁজে বেড়াছেন কেন ? আপনি তো তাঁর বাড়ি চেনেন । সেখানে চলে গেলেই পারেন ।

বাবুরাম ।
যাবার জন্যে তো বেরিয়ে পড়েছিলাম একবার । হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে মনে পড়ল, ঠিকানাটা আনা

হয় নি। যে-জামার পকেটে ছিল ঠিকানা লেখা কাগজটা, সেটা আমার গায়ে খাটো হয়ে যাওয়ায় আমার স্ত্রী সেটা পরতে দিয়েছিল তার ছোট ভাইকে। সে ছোটো ভাইও এখন আর ভারতবর্ষে নেই। কুয়েতে চলে গেছে চাকরী নিয়ে। তাতেই তো পড়েছি সমস্যায়। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে একটা চিঠিও লিখেছি। বছর তিনেক হয়ে গেল ঠিকানার অভাবে আজও পোস্ট করা গেল না। দাঁড়ান, চিঠিটা আপনাদের শোনাই। (বাবুরামের প্রস্থান।)

ঘৃতাচু। এনার অবস্থাও তো আমাদেরই মতো। আমরাও মানপত্র লিখে বসে আছি। অথচ কি করে যে সে মানপত্র তাঁর হাতে তুলে দেবো, সেই ভাবনাতেই এখন দিশেহারা।

কৃচঞ্চু। কাকু, একটা কথা বলবো।

ঘৃতাচু। বল্।

কৃচঞ্চু। সুকুমারবাবুকে তো কাক-পক্ষী জগতের কেউ চোখে দেখেননি। যদি শেষ পর্যন্ত তাঁকে খুঁজে না পাই, তাহলে এই বাবুরামবাবুকে সুকুমারবাবু সাজিয়ে সভাপতি করলে কেমন হয়?

ঘৃতাচু। তা কি করে হয়? আমরা তো সুকুমারবাবুর ছবিসহ

অফসেটে পোস্টার ছাপাতে দিয়েছি। তাঁর মুখের সঙ্গে এর মুখ মিলবে কি করে ? তখন তো জাল সভাপতি বুঝতে পেরে প্যান্ডেল ভেঙে তছ্‌নছ্‌ করে দেবে ছেলে-ছোকরারা।

কৃচঞ্চু। তাহলে কি কয়া যাবে এখন ?

বাবুরামের প্রবেশ। হাতে চিঠির কাগজ।

বাবুরাম। চিঠিটা পড়ছি।

ঘৃতাচু। আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়ুন।

বাবুরাম। পড়বার আগে একটা জ্ঞাতব্য কথা জানিয়ে দিই আপনাদের। সুকুমারবাবু আমাকে নিয়ে কবিতাটা লিখেছিলেন যে ছন্দে, সেই ছন্দেই এই চিঠিটা লেখা। পড়ছি তাহলে।

সুকুমার বাবু গো
খুঁজে খুঁজে কাবু গো
পেলে তব দরশন
প্রণামের বরষণ।
যে সুখের শেষ নেই
কুল নেই ক্লেশ নেই।
সেই সুখ-ভাণ্ডার
আমি যার কাণ্ডার
তুমি তার উৎসে।
আজ আমি যুত্সে

খাই ক্ষীর দুধ ভাত
নেই কোনো উৎপাত।
এই পর্যন্ত লিখে আর শেষ করা হয়নি, থেমে গেছি। আরও অনেক কিছু লিখবার ইচ্ছে গিজ্‌গিজ্ করছিল মগজে। কিন্তু ঠিকানাটা না পাওয়ার পর সে সব শুকনো খট্‌খটে আপন-ভোলা খেয়াল-খোলা আবেগ ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে একদম চাঁদিম হিম। (বাবুরামের ছেলের প্রবেশ)

ছেলে। বাবা, কুয়েত থেকে ছোটমামা এসেছেন।

বাবুরাম। বলিস কি ? এতো সাংঘাতিক রকম সুসংবাদ। তাহলে তো মনে হচ্ছে পেয়ে গেলাম বুঝি ঠিকানাটা। যাক্, বিপদের মেঘ কাটল তাহলে। আপনারা বসুন। ঠিকানাটা নিয়ে আসি।

(ছেলেসহ বাবুরামের প্রস্থান)

কৃচঞ্চু। দেখলেন তো কাকু, আমাদের ভাগ্য ভালো না হলে কুয়েত থেকে কেউ আচম্‌কা চলে আসে ? আপনি ঘাবড়াবেন না। ঠিকানা আমরা পেয়ে যাবো ঠিকই।

ঘৃতাচু। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

(বাবুরামের প্রবেশ)

বাবুরাম। মাননীয় অতিথিগণ, আমি যার পর নাই দুঃখিত। আমার রুগ্ন শ্যালক কুয়েতে গিয়ে হঠাৎ এমনই

কুমড়োপটাশ ধরনের মোটা হয়ে যায় যে, পরতে গিয়ে আমার দেওয়া সেই জামাটি পটাশ করে ছিড়ে যায় একদিন। এবং ঠিকানাসহ সেই জামাটি আমার শ্যালক ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। উঃ। কী মহামূল্য ক্ষতিই যে ঘটে গেল···। তবে আপনারা ঘাবড়াবেন না। এখন সহসা মনে পড়ছে, ঠিকানা পাওয়ার সম্ভাব্যতা পুরোপুরি সুদূরপরাহত নয়।

ঘৃতাচু । পাওয়া যাবে ?

বাবুরাম । শতকরা হিসেবে নব্বুইভাগ ইয়েস। এতদিন কেন যে নামটা মনে পড়ে নি, সেটা ভেবেই আমি আত্মস্তম্ভিত।

ঘৃতাচু । কার নাম মনে পড়ল হঠাৎ ?

বাবুরাম । ভবদুলালের। ভবদুলাল নাম আপনারা শোনেন নি। চলচিত্তচঞ্চরীর ভবদুলাল। লাল রঙের মলাট। চামড়া দিয়ে বাঁধানো। তার উপরে বড় বড় করে সোনার জলে লেখা চলচিত্তচঞ্চরী। সাইজ ডাবল ডিমাই। ওতে পৃথিবীর সব কথা লেখা থাকে, বই লিখবার সময় কাজে লাগবে বলে। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। বেশ কয়েকবার সাপের খেলা দেখিয়েছিলাম ওঁদের বাড়িতে। ভবদুলাল বাবু তখন সাপ-খেলানো সুরের স্বরলিপিটাও লিখে নিয়েছিলেন তাঁর ঐ খাতায়।

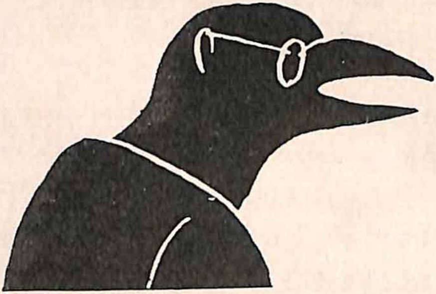
ঘৃতাচু । ওঃ, আপনি বাঁচালেন। ধড়ে প্রাণ এল। তাহলে কবে বা কখন রওনা হবেন সেখানে ?

বাবুরাম । সেটা টাইমটেবিল দেখে ঠিক করে নিচ্ছি। পাঁজিটাও দেখে নিতে হবে, কখন অমৃতযোগ।

(বাবুরামের প্রস্থান।)

কৃচঞ্চু । দেখলেন তো কাকু, বলছিলাম যে উপায় একটা হবেই উৎপন্ন।

ঘৃতাচু । এখন ভালয় ভালয় বাবু সুকুমার রায় শ্রীচরণেষু পৌঁছতে পারলেই ধন্য।





পূর্ণেন্দু পত্রী

বাবু সুকুমার রায় শ্রীচরণেষু